এই

কলকাতায়

গৌরকিশোর ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

মা ও বাবাকে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'এই কলকাতায়' রবিবারের 'সত্যযুগে' ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। বই হিসেবে বের করতে গিয়ে খোল-নলচে দুই-ই পালটাতে হয়েছে। বলতে গেলে খোলো হুঁকো থেকে গড়গড়া গড়েছি।

গৌরকিশোর ঘোষ

এই কলকাতায় আবার পা দিলুম।

নটা সাতান্নোর লোকাল থেকে বোরা-ছেঁড়া আলুর মতোই একদিন সবার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লুম গোটা প্লাটফরমে।

মফস্বল থেকে কলকাতা এসেছিলুম লেখাপড়া করতে। জ্ঞান দরিয়ায় পানসি ভাসিয়ে মনের সুখে বেশ কিছুদিন বৈঠা বাইবো এই আশা।

গড়পারে থাকতেন এক আত্মীয়। মস্ত মানুষ আমার সেই গুরুজন ব্যক্তিটি—যাঁর আশ্রয়ে থেকে দুনিয়ার চৌকাঠ পেরুবার পাঠ নিতে আসা। বিদেশ ফেরতা ডাকাবুকো লোক ; যাকে বলে কাবিল আদমী। সম্পর্কে খুড়ো।

ছেলে-বয়েস থেকেই তাঁর কথা শুনে আসছি। শুনে আসছি তাঁর সম্পর্কে নানারকম কাহিনী। বড় জাঁদরেল লোক, বেজায় রাশভারী, বেজায় বাঘরেশে—আরো কত কী!

আমি তো কাঠ গেঁইয়া। তার প্রতাপ পরিমাপের ফিরিস্তি শুনে আমার আধখানা আক্কেল আগেই গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল, বাকী আধখানা গায়েব হল তার সংস্পর্শে থাকতে হবে শুনে।

কিন্তু 'বাপ পিতাম' চোরের ভয়ে পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, বোধকরি সেইজন্যেই টাকাকড়ির দিকটা সংক্ষেপে গড়ের ময়দান করে রেখে গেছেন। আর নিজের হেকমতের চাক্কা গাড্ডায় পড়লে ভাগ্যমন্ত আত্ম'-স্বজনের গাড়ীর পেছনে চেপে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করাই তো রেওয়াজ-রীতি। অতএব ভবিতব্য ভেবে, *ভাগ্যদেবীর পায়ে মাথা ঠুকে অনেক খুঁজে বেরকরা* বাড়ীর কড়া নাড়লুম, দরজা খুললো।

আন্দাজ ছিল না। খুড়োর সেটা আফিস যাবার সময়। আমার বাঁ বগলে ময়লা শতরঞ্জি জড়ানো বিছানা আর ডান হাতে ঝোলানো চটাওঠা টিনের সুটকেশ। কাঠ বাঙালের মত আমার 'র' চেহারা খুড়োর গ্যালিশ আঁটা ধোপদুরস্ত ইজের ঢোকানো বপুটার পাশে যা মানালো, মনশ্চক্ষে চেখে নিয়ে জুতসই উপমা দেবার বয়েস সেটা ছিল না তাই রক্ষে।

আপাদমস্তক চোখ-ছোঁয়া করে খুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, কোত্থেকে আসছ? জিভ আমার মোটা হয়ে ঘোমটা টেনে বসেছিল একেবারে হারেমে। সেখান থেকে তাকে বে-পর্দা করা আমার পিতৃদেবেরও সাধ্য না। তাই কতকগুলো অবোধ্য শব্দ ব্যয় করা ছাড়া সুবিধে করতে পারলুম না। খুড়ো এমনভাবে ভুরু ছুঁড়লেন, সেটি যেন সপাৎ করে আমার গালে এসে দাগ কাটল। আমি আরও ঘাবড়ে গেলুম। প্রায় বে-সামাল হবারই অবস্থা।

আলাপের ব্যাকরণে মধ্যম যে পুরুষ তাকে কুলীন ক্যালকেশিয়ান্ বলা চলে না। তবু এদের ছাড়া কলকাতার আকর্ষণে, শুধু আকর্ষণ কেন পূর্ণাঙ্গতাতেও মস্ত বড় ফাঁক রয়ে যায়। নানারূপে এঁরা কলকাতার আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে রয়েছেন। এ ব্যক্তিটির জন্মস্থান যশোর। তবে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বড় বেশী একটা নেই। কলকাতাই এখন ফাদার-মাদার। এর একটা বিজলী বাতির দোকান আছে। খুড়োর পরামর্শে লেখাপড়া শিখে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানোর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের থোতাটা লাথি মেরে ভোঁতা করে মনে মনে চৌষট্টি যোগিনীর নাম জপ করে ভিড়ে গেলুম 'মানুষ হবার' খাটালে।

সুপারিশ করলেন খুড়োই। খাতিরের মানুষের অমন অনেক এঁড়েকেই নাকি ভদ্দরলোক একেবারে তালপাকা মানুষ বানিয়ে ছেড়েছেন। ঢুকতি মুখেই যা লিষ্টি শোনালেন তাদের, তা শুনে আমার ভক্তি অ্যা-সা বেড়ে গেল তার উপর, যে মন-প্রাণ তখুনই তার গব্দা গব্দা দুটো পায়ে সমর্পণ করে (মনে মনেই) বললুম, প্রভু আমি তোমার দাস, তোমার খুশিমত আমাকে গড়ে-পিটে নাও। তোমার কাছ থেকে শিখে-বিখে নিয়ে "হাজার হাজার" টাকা রোজগার করে তোমার জুতোর পেরেক কটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে গুরুভক্তির নতুন এক্জাম্পল্ সেট্ আপ্ করবার একটা চান্স করে দাও দয়াময়।

যেন আমার বাসনা টের পেলেন। মুচ্‌কি হেসে বললেন, জ্ঞান কঅক্ষরগোমাংস উড়ে মেড়োগুলো, বোমা মারলেও ভুড়ভুড়ি ছাড়া কিছুই বেরোয় না, তারাও মাসে ৭।৮শ টাকা বেমালুম জুতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর তোমরা তো যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছ হে, মাসে মাসে হাজারের কমে তো কথাই কইবে না। তাই এত করে বলি টেকনিক্যাল কাজ শেখো। লেখাপড়া শিখে শিখে তো সব হল। কলম ধরে ধরেই তো দেশের এই অবস্থা। এবার একটু লোহা ধর (যেন কলমে লোহা নেই)। দেশে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ রোয়াব উঠেছে। কি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কাব্যি করে ছোড়া-গুলোকে লঙ্কা বানিয়ে ছেড়েছেন। ওর চেয়ে লালামোহন দাস ঢের বড়। লোকটার হেকমত কত। দেশের লোকের অন্ন যোগাচ্ছে। বুঝলে হে ছোকরা, আমি যে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বলতে নেই, আমার পয়েও তো করে খাচ্ছে কটা। মনস্থির করে কাজে লেগে পড়, ভেগে পড় না। হবে তোমার। তোমাদের জন্য লোকসান দিতে দিতেই আমার এ জন্ম যাবে। তবু বলতে নেই, যদি মানুষ হও সেই আমার পুরস্কার। যাদবপুর শিবপুরে যে বড়লোকের এঁড়েগুলো পড়ে, এক কাঁড়ি টাকা উড়িয়ে মাথা ভর্তি থিওরীর বোঝা বয়ে বাড়ী ফেরে, জানেই বা কি আর বোঝেই বা কি ? তা আমার লোকসান করেও তোমায় শেখাব। আর একেবারে ফোকটেও নয়। শর্মা

কারো কথার ধার ধারে না। কোনদিন যে বলবে অমুক আমাকে মাঙ্‌না খাটিয়ে নিয়েছে, তার মধ্যে নেই বাবা। তোমাকে রোজ তিন পয়সা করে জলপান দেব। রাজী থাকতো এস।

ঘাড় নেড়ে রাজী হলুম্, কোমর বেঁধে কাজে নামলুম্, ৭টা ৬টা কাজ।

এটা হল কেসিং, এটা চাপা, এটা কনডিউট পাইপ, ওটা ফিলেকসিবিল তার, এগুলো কিলিট, ওইটে বিলাক টেপ, ওইটে শেড্, এই যে বালব্, ফিউজ্ তার, জয়েন তার, ব্রাকিট, ওটা লেড ওইয়ার—আরো কত।

যেটা দেখি, যত দেখি, তত হাত বুলুতে ইচ্ছে করে, তত দ্রব্যগুলোকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। যত ছুঁই বুক টিপটিপ করে। বুকের ভেতর ঢেঁকি পেতে নতুন বউ ধাপড় ধোপড় হলদি কুটতে থাকে যেন। আর কি? লায়েক হতে আর কত দেরি? রাত তিন প'র তো তখনই হয়ে গেছে, যে মুহূর্তে দোকানে ঢুকেছি। এখন লেপের বাইরে নাক জাগিয়ে সেরেফ প্রতীক্ষা কর রোদ্দুর ওঠবার। হাজার টাকা কত টাকা কে জানে রে বাবা? গরীব বাবার ঘরে একশটা তামার পয়সা কখনও একত্তর দেখিনি, তবে মনে মনে বিশ্বাস ছিল নিশ্চয় অনেক হবে, নইলে হাজার টাকার উল্লেখ করে লোপানী দেখাবে কেন?

হঠাৎ একদিন মালিক বললেন, ওহে ছোকরা, বেশ তো কদিন বাতাসে ফুরফুরি কেটে বেড়ালে। এবার যে কাজে নামতে হয়। এ সব কাজের প্র্যাকটিকেল জ্ঞানই তো আসল। যাও আজ থেকে রামদয়ালের সাগরেদী কর। ও এ লাইনের পাকা ঝুনো। অনেক ডিগ্রীওলা এক্সওয়াইজেডকেও ঘামের ফোঁটায় সমুদ্দুর দেখিয়ে ছাড়ে। বাগিয়ে বুগিয়ে যদি ওর কাছ থেকে খসাতে পার বিদ্যেটা তো মার দিয়া কেল্লা। কুলির সঙ্গে কাজ করতে গেলে ও ভদ্দরলোকমি চলবে না। কাছা পাকিয়ে টাইট করে তবে কাজ শিখতে হবে, বুঝলে। এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যে না বুঝে উপায় ছিল না। আমার অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎটা খাঁচায় ঘেরা নৃত্যপরা ময়ূরের মূর্তি নিয়ে হাজির হল। ঘামাচির ওপর পালক বোলালে যে রকম সুখ সুখ লাগে অনেকক্ষণ ধরে তাই টের পেতে লাগলুম।

ঘণ্টাখানেক পর রামদয়ালের সশরীরে আবির্ভাব। পয়লা সম্বোধন শুনেই দিল কাবুল নদীর পানি হয়ে গেল। বাজখাঁই গলা শুনে ভাবলুম, পদ্মার চরে হাড়িচাচার প্রেমালাপ হচ্ছে। হিজমাস্টার ভয়েস বিজ্ঞাপনের জন্যেই রেকর্ডটা ওর গলায় ফিট করে দিয়েছে।

ই'য়ে লৌণ্ডে কিলিট ওগারা বাহার কিয়া হ্যায় ক্যা। ভাবে বুঝলুম আমাকেই বলছে। এক বর্ণ বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলুম। বয়ার হ্যায় ক্যা। এবারও বাক্য খরচা

করলুম না। নেহি শুননে পাত্তা উল্লুকে পট্ঠে। বলেই বিরাশি দশ আনার একখানা পাকি থাপ্পর হাঁকড়ালে। ইস্কুলে আমি চিরকাল গোঁত্তা খেয়ে এসেছি। প্র্যাকটিসটায় একেবারে মরচে পড়েনি বলেই হোক, কি আগের দিন একটা ক্যালেণ্ডারে জর্দার বিজ্ঞাপনে ছুকরি ছুকরি কমলে-কামিনীটাকে একটা নিঃস্বার্থ প্রণাম ঠোকার জন্যেই হোক, ষোল আনা থাপ্পড়টা গালে না পড়ে গর্দানে পড়ল। আহা সে কি দৃশ্য দেখলুম। ইলেক্‌টিরির লাল লাল পজেটিভ আর হলদে হলদে নেগেটিভ-গুলো আমার চোখের মধ্যে পিড়িক পিড়িক চোখ মেরে মেরে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে আর মুখে লালামোহন দাস লালামোহন দাস আওয়াজ করছে। কানের ভেতরে ঝমম্ ঝমম্ শব্দে মালুম করে নিলুম টাকশালের লোকগুলো হাজার টাকার তোড়া বাঁধছে আর আবছা আবছা দেখতে লাগলুম আমি একটা ঝুমরোচুলো কুকুর হয়ে মালিকের জুতোয় ঠকাস্ ঠকাস্ ছোট ছোট সোনার পেরেক মেরে চলেছি।

শুনেছি চণ্ডুর নেশা নেশার রাজা। কিন্তু তারও স্থায়িত্বের একটা সীমা আছে। সেও এক সময়ে ফিকে হয়ে আসে। আর এতো সামান্য থাপ্পড়, হোক না তা ছাতু খাওয়া হাতের শুকনো, কেঠো। থাপড়ার ধকল কেটে গেলে যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করলুম। থাপ্পড়টা আচমকা নাড়া দিয়ে আমার জ্ঞানচক্ষুর চশমা থেকে সবজে আবরণটা ফেলে দেওয়ায় সব কিছু ধোওয়া

পাখলা ছাপছোপ দেখতে লাগলুম। মনে মনে অষ্টোত্তর শতবার গুরুর গুরু দাসমশাইএর নাম স্মরণ করে প্রাইমারী গুরুকে বিনয় করে বললুম, হুজুর আমি হিন্দি জানিনে। গোস্তাকী মাফ করবেন।

কেন জানিনে আমার ছোটবেলা থেকেই ধারণা হুজুর কথাটা খুব সম্মানজনক আর শব্দটা যখন কেমন কেমন তখন নিশ্চয়ই ওটা হিন্দি। হুজুর সত্যিই খুশী হলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে, বেলা প্রায় বারোটার সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের পিচগলান ঠাঠা রোদ্দুরের মধ্যে হুজুরের পিছু পিছু দুপা যেতে চেনখোলা এক চার্লস দি ফার্ষ্টের আমলের বাইকের সামনে একরাশ চাপা কেসিং আর পিছনের কেরিয়ারে আধমণটাক কিলিটের বোঝা নিয়ে রওনা দিলুম শ্যামপুকুর। একদিনে বেশী বোঝা চাপান বোধহয় অনুচিত ভেবেই হুজুর নেহাত দয়া করে নিজের অধিকারের নতুন পিলিপস্টাতে টুকিটাকি যন্তর হেতেরগুলো আর দু কয়েল তার ঝুলিয়ে আমার আগে আগে যেতে লাগলেন। চেন খুলতে খুলতে বোরা সামলাতে সামলাতে জানটা যখন নাকের লোমের ডগে আসব আসব করছে তখন একটা বিরাট কম্পাউণ্ডঅলা চৌতলা নতুন তৈরী বাড়ীতে পৌঁছে গেলুম। গেটের সামনে এক ডাগড়াই মাড়োয়ারীবাবু পুলোর ওপর কাপড় তুলে আর গলাবন্ধ কোটের ওপরকার বোতামগুলো ভুঁড়ির ওপর থেকে খুলে দিয়ে কাজকর্ম

তদারক করছিলেন। তাকে দেখে এমন যে বাগদাই আমার হুজুর তিনিও কাঁচুমাচু টোকা মারা কেন্নো হয়ে গেলেন। সাতগজী কাপড়েও যার পিরেনের মুহুরি মারা যায় না, সে রকম একখানা বপু থেকে যে মদ্দা পাঁতিহাসের ডাক শুনব এ আশা করিনি। তবু সেই ফিসফিস গালাগাল যে তোড়ে বেরুতে শুরু করল ফায়ারব্রিগেডের দশ পয়েণ্ট হোস বলে চারবার সেলাম দিই।

গালাগাল খেয়ে হুজুর আমার মুখখানা চণ্ডীচরণ নায়েকের চুনের মতো ফ্যাকাশে করে নীচের তলার একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। পেছনে পেছনে আমিও। হুজুর গজগজ করতে লাগলেন, আমি দ্রব্যাদি ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলতে লাগলুম। হুজুর গজগজ করছেন আর তদারক করছেন। তদারক করছেন আর গজগজ করছেন। হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, সিমিণ্ট কাঁহা? আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম বুঝতে না পেরে। আপনা থেকেই দু পা পেছিয়ে দাঁড়ালুম। ঘাড় গর্দানে রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হল। আমতা আমতা করে বললুম, আজ্ঞে? হুজুর বললেন, সিমিণ্ট কাঁহা, সিমিণ্ট? যেন বুঝলুম বুঝলুম মনে হল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, সিমেণ্ট? হা সিমিণ্ট, কাঁহা হ্যায় সিমিণ্ট? বলতে পারলুম না, তা আমি কি জানি। উল্টে জানি জানি মুখ করে সামনে একটা ছেনি দেখতে পেয়ে সেই দিকে দৃষ্টিটাকে এমনভাবে নিবদ্ধ

করে রইলুম যেন আমার দৃষ্টির ওমে ছেনির খোলা ফেটে পিঁক পিঁক করতে করতে গাদা গাদা সিমেণ্ট বেরিয়ে আসবে। সিমিণ্ট কাহে নেহি লায়া? সেই ভীম গর্জনে পড়ে বলতে পারলুম না, আমাকে তো কেউ বলেনি, কি করে জানব ইলেক্‌টিরির কাজে সিমেণ্ট কর্ণিক দরকার হতে পারে। উল্লুকে পট্‌ঠে। এইটুকু শুনেই গোঁত্তা খাবার জন্য মুকিয়ে রইলুম। আহা কার যে মুখ দেখে উঠেছিলুম সকালে। কিন্তু না। বজ্রপাত ঘটল না। মেঘের কাঠির দিশী বারুদ জ্বললো না। তার বদলে এল আদেশ। এখুনি দোকানে গিয়ে সিমেণ্ট নিয়ে এস। তুরন্ত্। আবার সেই পিচগলানো ঠাঠা রোদ্দুর, আবার সেই চেন খোলা বাইক। মনে হতেই আমার পায়ের তল থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। মনে মনে খুশী হয়ে মা জানকীর মাকে ডেকে বলতে শুরু করলুম, হাঁটা যদি করোই একটু বড় করেই করো দিদিমা, যাতে একে ঝট্‌কায় কোশ খানেক নীচে চলে যেতে পারি।

রবিঠাকুর এই কলকাতারই বাসিন্দে ছিলেন। কলকাতার নাড়ীনক্ষত্রের সঙ্গে ছিল তার অষ্টপাকের বাঁধন। তিনি কলকাতার এমন একজন ঘুঘু বাসিন্দে হয়েও ইলেক্‌টিরির দোকানে তিন পয়সা রোজে অন্তত পক্ষে তিন মাস কাল একটিনি করেননি এ কথা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করছিনে।

কলকাতার মতো এত বড় একটা সাজানো গোছানো জলুসদার শহরটার সঙ্গে কেউ আর সাধ করে মিনি মাঙনায় বনবাদাড় বদল করে নিতে যায় না। "দাও ফিরে সে অরণ্য লও হে নগর"—এই প্রার্থনা সুস্থ সবল লোকের মুখ দিয়ে একমাত্র তখনই বেরুতে পারে, যখন দেড় ঠ্যাঙা একটা নড়বড়ে কাঠের মই সম্বল করে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভোঁতা ছেনি দিয়ে ছ্যাদা ফুটো করতে বাধ্য হতে হয়। তখনই—একমাত্র তখনই ইট কাঠ লৌহ ও প্রস্তরের উপর চিরজীবনের মতো ঘেন্না ধরে যায়।

কাঁঠাল পচা গরমে বদ্ধ ঘরের ছ্যাদে 'গুলি' ঠুকছি, সেঁচা সমুদ্দুরের চলকে পড়া পানি আশ্রয় করছে আমার জামা গেঞ্জি ইজেরে। গোটা শরীরটাকে ব্রহ্মাণ্ডের একটা মিনিয়েচার মডেল ধরে নিয়ে নাকের ডগে কল্পনার একটা শাঁখে ফুক দেওয়া ভগীরথকে ছেড়ে দিলেই বাকী চিত্রটা হুড়হুড় করে এসে যাবে। চেহারা এদিকে দাঁড়িয়েছে তেলে ভেজা 'শুবচুন্নী' ঠাক্‌রুণের মতোই। উপর দিকে চোখ তুলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছেনি চালালে যাবতীয় চুন বালি সিমেণ্টের গুঁড়ো গঙ্গাস্নানের যাত্রীদের মতো গাঁটছড়া বেঁধে বেমক্কা চোখে ঢুকে পড়ছে। সেটা বাঁচাবার জন্য ছুটো আঁখিপক্ষ্ম বন্ধ করেছি কি অমনি হাতুড়িটা ছেনির মাথা ছেড়ে আমার বুড়ো আঙুলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফোকটে ছুছিলিম তামাক খেয়ে যাবার তাক খুঁজছে। বাইরে যখন এমন

টালমাটাল অবস্থা, ভেজাল শেয়ারে টাকা গস্ত করে মা কালীকে পাঁঠার ল্যাজনাড়া দেখানোর বন্দোবস্ত, মগজের ভেতর তখন রবিঠাকুর ও ইলেক্‌ট্রিকের দোকান শীর্ষক এক ওরিজিন্যাল প্রবন্ধের খসড়া উরুল মাছের পোনার মতো চোখ ভাসিয়ে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। তখন যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতুম যে উত্তরকালে একদিন লিখিয়ে হবো, তবে পয়েন্টগুলো আস্তিনে টুকে রেখে দিলে 'আজ হায় মাতাব্দি' 'হায় কেতাব্দি' করে চুল ছিঁড়ে টাক বানাতে হতো না।

দেড় ঠ্যাঙা কাঠের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানাবিধ কসরত করে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁচিয়ে ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা কাল সিলিংএর নীচে গভীর অভিনিবেশ সহকারে গুলি ঠুকে চলেছি। হাতের তেলোয় ফোস্কা পড়ে বহুত গাড়াগর্ত সৃষ্টি হয়েছে। নাজেহাল হয়ে একটু থেমেছি কি নীচ থেকে রামদয়াল খৈনী টিপতে টিপতে হুংকার ছেড়ে উঠছে। জলদি ফিনিস্‌ করণা চাহি, সমঝা। হুন আক্রমণের ভয়ে চীনেরা যদি অতবড় একটা প্রায়-পিথিম পাঁচিল গেঁথে তুলতে পারে তো আমার পক্ষে কংক্রিটের ছ্যালে গোটা কয়েক ফুটো করা এমন আর অসম্ভব কি? ছ্যালে গুলি ঠুকছি। মন কিন্তু নৈলে গরুর মতো ষাঁড় দেখে এদিক সেদিক ছুট মারছে। মনটাকে ধমক লাগিয়ে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হয়ে সবেমাত্র পারিপার্শ্বিকটার সরেজমিনে তদন্ত করতে যাব, দেখি প্রভুজী রামদয়াল শানের মেঝের উপর

কিলিটের বোরা মাথায় দিয়ে চিতপাত শুয়ে রাষ্ট্রভাষায় নাক ডাকাচ্ছে। দেখে কমলাসন কেষ্ট ঠাকুরের পটচিত্রটি চোখের সামনে আহামরি রূপে ভেসে উঠল। আর কিছুর জন্যে না হোক বেচারা হাতের তেলোদুটোকে একটু জিরেন দেবার ইচ্ছেয় সিঁড়ি ঠেসান দিলুম। চোখের পাতাদুটো ভারী ভারী ঠেকল। তারপর কখন অজান্তে হাতটা ছেনি হাতুড়ি সমেত সমে পৌঁছে গেল বুঝতে পারিনি।

বাহাদুর শাহ ছিলেন আলমগীর আওরংজীবের অক্ষম উত্তরাধিকারী। ইতিহাস মারফত আমরা এইটুকুই জেনেছি। যেটুকু জানিনে তা হচ্ছে এই ঃ—

বাহাদুর শাহ কলা শিল্পে সমঝদারিটুকু পেয়েছিলেন বাপ দাদার কাছ থেকে হাওলাত বরাত করে। পোশাক পরিচ্ছদ বানাবার শখ তাঁর ছিল খুবই শক্ত্। দেশবিদেশ থেকে এই উপলক্ষে মস্থর দরজি ওস্তাগরদের আমদানি হয়েছিল দিল্লীতে।

শোনা যায় একবার দরবারে ধুতি চাদর বেনিয়ান পরা এক বাঙালীকে দেখে বাদশাহের শখ চাপল বাঙালী পোশাক পরবার। দিল্লীর দর্জিমহলে তুলকালাম পড়ে গেল। কিন্তু বাদশাহ ছিলেন সাচ্চা সমঝদার। হাতুড়ে চিকিচ্ছের উপর তার চিরদিনের বীতরাগ, তাই ঢাকায় লোক পাঠালেন। সেখান থেকে দর্জি এল, আনা হল মসলিনের ধুতি চাদর, আর বেনিয়ান বানাবার ছিট। ঢাকাই দর্জি যেদিন এসে পৌঁছুলো সেদিন রাজধানীতে কি হই চই। দেওয়ালী পরব

বসে গেল যেন। চারদিকে ধুম-ধাড়াক্কা, নাচনা গাওনা আতসবাজীর খেল। এলাহী কাণ্ডকারখানা।

দর্জি তো মাপ-জোঁক নিয়ে একটা বেনিয়ানও সাইজ মতো বানিয়ে ফেললে। সব ঠিকঠাক। চারদিকে খবর এত্তালা গেল। দরবারের দিন স্থির হল। লোকজন, অতিথি-অভ্যাগত, পর্যটক, মুসাফিরে শহর দিল্লী গিসগিস। দেশ-বিদেশ থেকে সবাই দিল্লীতে এসে হৈ-হুড়্দুদ্দুম লাগিয়ে দিলে বাদশাকে নতুন পোশাকে দেখবার জন্য। সবই হল কিন্তু মুশকিল বাধল বাদশাকে ধুতি পরাতে গিয়ে। বাদশার চোদ্দপুরুষ ফিতে বাঁধা ইজের কোমরে সাঁটতে অভ্যস্ত। ধুতির সাড়ে তিন প্যাঁচ রপ্ত হবে কেমন করে? ধুতিটা কোমরে ফিট করবার কৌশল করতে বাদশা হিমসিম। যত কায়দা করেই ধুতি পরেন, প্যাঁচের পর প্যাঁচ কসেন কিন্তু গেরো আর বাঁধা হয়ে ওঠে না। ধুতিখানিও মাধ্যাকর্ষণের নিবিড় টানে বারে বারে হাঁটুর নিচে আশ্রয় নিতে চায়। ফসফস করে খুলে খুলে গিয়ে বাদশার সঙ্গে ইয়ারী মস্করা জুড়ে দেয়। ওদিকে দরবারের গিসগিস লোক বাদশার প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে মিনিট গুনে চলেছে। আর এদিকে বাদশা ঘেমে নেয়ে ছয়লাপ। মেজাজ তিরিক্ষে, পাকা জম্বুরোর মতো টুকটুকে গাল বেয়ে দদ্দর করে মোঘলাই ঘাম ঝরে পড়ছে। সাতজন পোশাক বরদার বরবাদ হয়ে যাবার দাখিল। বেইজ্জতি হবার

আশঙ্কায় বাদশার মেজাজ ততক্ষণে হিন্দুকুশের মাথায় চেপে গেছে। নিজের কোটে পেয়ে সূর্যটাও গরমের তা দিয়ে চাটিম ফাটাবার তাক খুঁজছে।

ঘণ্টা চারেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর, বাদশা রেগে টং। বললেন, এ দর্জিটার শয়তানী। ডাক ওকে। ঢাকাই দর্জিকে ধরে আনা হল। বাদশা বললেন, যদি এ পোশাকটাকে ঠিক মত কোমরে আটকে দিতে না পার, তবে তোমার গর্দান কোমরের নিচে চলে যাবে। ঢাকাই দর্জি এক আঁচড়েই ব্যাপারটা আঁচ করে ফেললে। মিনতি করলে, হুজুর দু ঘণ্টা সময় দিন ঠিক করে দিচ্ছি। তারপর সে মগজে তা দিয়ে মাপ-জোঁক নিয়ে মসলিনের ধুতিটা দিয়ে একটা সালোয়ারের মতো বানালে, সঙ্গে দিলে একটা কোঁচা ফিট করে। ব্যস্। বাদশা তো মহাখুশী। সেই অদ্ভুত বাদশাই ধুতি পরে দরবার করলেন। দর্জিটাকে জমি জায়গীর ইনাম দিলেন।

ওই ঢাকাই দর্জিই পরে জব-চার্ণকের সঙ্গে কলকাতায় এসে হাজির। আর তার তিন পুরুষ পরেই দর্জিপাড়ার পত্তন।

ইতিহাসটি আমার গৌরদাসের মুখ থেকে শোনা। গৌরদাস সেই দর্জিপাড়ার ছেলে।

গৌরদাস আমার গুরু। কলকাতায় এসে জ্ঞানের গুদামে

আমার যা কিছু সঞ্চয় তার প্রায় অর্ধেকটাই গৌরদাসের দৌলতে।

বিজলীর দোকানের যে তিনজন পয়লা নম্বরের মিস্তিরি ছিল ও তার একজন। কালো দড়ি পাকানো চেহারা। সাদা চোখে ঠাহর হয় না, বয়েস আন্দাজ করতে খুব বেশী পাওয়ারের দূরবীন লাগে। ফ্যাসফেসে আওয়াজে সব সময় কথা বলে চলে। চোখ দুটো সর্বদা চটক চঞ্চল।

রামদয়াল মিস্তিরির একটিনি কত্তে কত্তে আমার হাল যখন গ্যারেজে পাঠাবার মত, ঠিক সেই সময় গৌর সাযুজ্য লাভ।

শ্যামপুকুরে একটা পেল্লায় বাড়ীতে বিজলী ফিট হচ্ছিল। তিনতলে বাতি বসানো ফিনিস। এবার দোতলায়। রামদয়াল আসেনি। মালিক সেদিন গৌরদাসের সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিলেন। গৌরদাস প্রথমেই তিনতলায় উঠে আগের কাজকর্ম-গুলো সব দেখে নিলে। তারপর হঠাৎ আমাকে ডাক দিলে, এই শোন্। বেজায় রাগ হ'ল আমার। কথা নেই বার্তা নেই তুই তোকারী! রামদয়াল আমার ওস্তাদ মানুষ। যা খুশী বলবার এক্তিয়ার তার আছে। কিন্তু তুমি কে হে বাপু? বন কি চিড়িয়া। ঝোপ থেকে মুখটি বার করেছ কি না করেছ, অমনি তুই ফুই।

জবাব দিলুম না। ঘরের ছ্যালে পলেস্তারার শোভা দেখতে লাগলুম। গৌরদাস এগিয়ে এল। বললে, কি রে কানে শুনতে

পাসনে বুঝি? বললুম, কখনো কখনো পাইনে। তা কি বলছেন। গৌরদাস বললে, কি, কি বললি? বলছেন? বলছেন কাকে বলছিস্? আমাকে! তার পরেই হো হো করে এক হাসি। বেশ করে আমার দিকে চেয়ে নিলে, তারপর আবার গড় গড় করে হেসে নিলে খানিকটা। হাসি থামলে বললে, শোন্, এসেছিস্ মিস্তিরিগিরি করতে। ওসব আপনি আজ্ঞে বজায় রাখলে খরচা পোষাতে পারবি নে। বুঝলিস্? সেরেফ তুই তোকারী চালাবি।

আমার তেরিয়া মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল। মন জানাজানি হয়ে গেলে আবার বাধাটা কোথায়। দিল খোলসা করে আবার কাজকর্ম দেখাতে লাগলুম। সব ছ্যালেই আছে আমার গুলি ঠোকার স্বাক্ষর। আদ্যোপান্ত সব দেখে গৌরদাস আমায় জিজ্ঞাসা করলে, সব গুলি তুই ঠুকেছিস্? গর্বের সঙ্গে মাথা নাড়লুম, হ্যাঁ।

গৌরদাস আমার ভাবসাব দেখে গম্ভীরসে বললে, তা এত জায়গায় এত গুলি ঠুকতে পারলি, আর দুটো গুলি ঠুকতে পারলি নে। কাজটা একেবারে কমপ্লিট হয়ে থাকত। ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায়? গৌরদাস বললে, তোর নীরেট মাথায় রে উল্লুক। লেখাপড়া শিখেছিস্ না। একটা পাস দিয়েছিস না। সে সব কি কত্তে? এই বারদিনে তোকে দিয়ে এতগুলো গুলি ঠুকিয়ে নিলে সে নচ্ছারের ব্যাটা, আর তুই হাঁ

না কিছু বলে তাই করে গেলি। এই আকাড়া বুদ্ধি নিয়ে এখানে এসেছিস্ কি কত্তে? যা যা, বাপ মায়ের কাছে কেটে পড়। না হলে পাঁচ পাল্লায় পড়লে আর বাপ ডাকতে দেবে না। গালাগাল খেলুম। গালগুলো হজম করলুম। গৌর-দাসের সঙ্গে জুড়ে দিলুম নিজেকে সে প্রায় শিরীষের আঠা দিয়েই।

শ্যামপুকুরের বাড়ীর কাজ শেষ হল। জিনিস পত্তর গোছ-গাছ কত্তে উপরে উঠে দেখি কাঠের সিঁড়ি রয়ে গেছে একখানা। বেজায় ভারী। রামদয়ালের ধমকে প্রাণান্ত করে ওটাকে তেতলায় তুলেছিলুম। প্রকৃত ওজন বুঝতে পারিনি। নামাবার সময় আর পারলুম না। গৌরদাসকে ডাক দিলুম। গৌরদাস এসেই বললে, দে শালাকে পটকে। আমতা আমতা করে বললুম, ভেঙে যায় যদি। গৌরদাস হেসে ফেললে। তোর দেশ কোথায় র‍্যা। এত উঁচু থেকে ফেললে ভাঙবে না! ঢোঁক চিপতে চিপতে বললুম, তবে? গৌরদাস বললে, তোর ওই মাদী কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগে না মাইরি। যদি ওটাকে না ফেলতে চাস্ তবে কাঁধে করে নামিয়ে নিয়ে যা। আর নইলে ফেলে দে। ভাঙে ভাঙল। তোর আমার কি? ব্যাটা চশমখোরের ট্যাঁক খসবে। ভয়ে ভয়ে বললুম, যদি বকে? বকলে গাল খাবি। পুরুষ মানুষ হয়েছিস্ গালমন্দ না খেলে পাকবি কি করে? আর দ্যাখ্, যারা

অনিচ্ছায় দোষ করে গালমন্দ খায় তারা বেকুব। কিন্তু যারা ইচ্ছা করে দোষও করে গালমন্দও খায় তারাই খাঁটি বাহাদুর। বুঝলিস্? তবুও ভয় যায় না। ভয়ে ভয়ে বলি, যদি দাম আদায় করে নেয়? এবারে হা হা করে হেসে ওঠে গৌরদাস। তোর মাথাটাকে মাইরি ফরমাশ দিয়ে বানিয়েছিল বিশ্বকর্মা। কোথাও আর এক আধটুকু ফাঁক ফোঁকর রাখেনি। মাইনে পাস্ তো তিন পয়সা। এই সিঁড়ির দাম কম করেও চল্লিশটি টাকা। দাম আদায় করতে গেলে তো ভালই হবে, তোর চাকরি আরো কিছুদিন পাকা হয়ে যাবে।

এর পরেও ভাবনা চিন্তা করব এতটা কেঁদো-গাড়ল সৃষ্টিকর্তা আমায় করেন নি। মাতা বজ্রযোগিনীর নাম স্মরণ করে দিলুম সিঁড়িটাকে সোজা পথে পৌঁছে।

একদিন দুপুরে দোকানে বসে আছি। খুব গুলতানি চলছে। এমন সময় ফোন বাজল ক্রিং ক্রিং। ফোন ধরলে গৌরদাস। তারপর কথাবার্তা বলা শেষ করে আমাকে বললে, এই, দুটো থলিতে বড় বড় দেখে গুলি ভরে নে, বুঝলিস্? এক্ষুণি মাইরি পাগলা ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে।

পাগলা ডাক্তার একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক। পৃথিবীখ্যাত বলেই নামটা করলুম না। কেস করলে ফেঁসে যেতে পারি। আমাদের মধ্যে তিনি ঐ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিসের থেকে তাঁর এ নামকরণ হল এটা জানলেও কে যে তার

নামকরণ করেছিল তা বলতে পারব না সায়েন্স কলেজের একজন হোমরা-চোমরা আদমী।

তোড়জোড় করে ছুটলুম তাঁর বাড়ীতে আমি আর গৌরদাস। সঙ্গে ছুটো ঝুলি বাছা বাছা গুলি দিয়ে ঠাসা। সদর গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখলুম, এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক বারান্দায় পায়চারি করছেন। আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই তিড়বিড় করে হুংকার দিয়ে উঠলেন, অ্যাই অ্যাই, এ বাড়ী নয়, এ বাড়ী নয়। দোসরা বাড়ী ছ্যাখ। আমি তো রীতিমত ভড়কে গেলুম। গেটের ওপর জ্বলজ্যান্ত নামের অতবড় পেলেটখানা চোখ পাকড়ে জানিয়ে দিচ্ছে এই বাড়ী। ভদ্দরলোককেও চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ তিনি খাঁচায় পোরা চিতের মত হাঁকড়ে উঠলেন, ব্যাপার কী? গৌরদাস বাড়ী ভুল করেনি তো।

ভ্যাবাগঙ্গারামের মত ওর দিকে চাইতে দেখে গৌরদাস হেসে ফেললে। বললে, ঘোলালে মাইরি। বড় বড় লোকের কারবারই আলাদা, বুঝলি? তারপর গলায় একটু জোর দিয়ে বলে উঠল, আমরা স্যার ইন্‌জিনিয়ার টু দি ইলেক্‌ট্রিক। গৌরদাসের রকমখানাই ওই। যখন যে কাজই করুক গালভরা নাম একটা বসিয়ে দেবে অলওয়েজ। বলে, পোসা যখন খরচা নেই, বুঝলিস্? ভদ্দরলোকের এতক্ষণে হুঁশ হল। আ তোমরা মিস্তিরি। গুড্। কাম অন্। তাড়াতাড়ি। তোমাদের জন্যই তো অপেক্ষা করছি হে।

আমরা এগিয়ে গেলুম। খুশী খুশী উনি খানিকটা এগিয়ে এলেন। ঝোলাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, আ, এনেছো তাহলে। বড় বড় দেখে এনেছো তো। আরে হোয়াট ইজ দিস্। বলে আমার কাঁধে এক রাম থাপ্পড়। আমি তো দস্তুরমত পিত্তি-হেঁচকি তুলে ফেললুম। কি কপাল একখানা আমার! মনে মনে ভাবলুম, লাথি ঝাঁটা ছাড়া ভাল কিছু জুটবে না। এঁর সঙ্গে জন্মে সাক্ষাৎ নেই আমার, মাত্তর মুখখানা দেখেছেন কি দেখেন নি, হাঁকড়ে দিলেন একখানা পাকী পাঁচসেরি থাপ্পড়। একটা অদ্ভুত জাতের ডেয়েপিঁপড়ে আমার কাঁধে চড়ে বিনি মাশুলে চলে এসেছিল। তারই ফল। মরা পিঁপড়েটা নিয়ে হাঁকডাক করে একটা শিশিতে ভরে ভেতরে রেখে এলেন। আমরা হা পিত্যেশ করে বারান্দার কড়িকাঠ গুনতে থাকলুম বসে বসে।

ভদ্দরলোক আচমকা বেরিয়ে এসেই বললেন, কই গুলি কোথায়? আমরা থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বের করতে লাগলুম। কিন্তু তাঁর আর পছন্দ হয় না। আরও বড় চাই। বিগার। এত ছোট ছোট এনেছো কেন? বলে দিইনি বড় বড় দেখে আনতে। এক এক করে সব দেখালুম। ঝুলি উপুড় করে দিলুম। দুজনের অন্নপ্রাশনের ঘাম পর্যন্ত ছুটে বেরুলো। ওঁর খুঁতখুঁতানি তবু আর যায় না। বিগার বিগার বলে চিল্লিয়ে চলেছেন। গৌরদাস শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে।

বিরক্ত হয়ে বললে, গুলি স্যার এর চেয়ে বড় হয় না উনিও তেড়ে উঠলেন, হয় না তো কাজ চলে কি করে?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কাজটা কি আপনার তাই বলুন না স্যার। কি করবেন বড় বড় গুলি দিয়ে? উনি যা জবাব দিলেন তাতে আমরা দুজনে সংক্ষেপে বসে পড়লুম। বললেন, হরিণের মাথা টাঙাব বারান্দায়।

বারান্দার এক কোণে ডাঁই করা গোটা পাঁচেক হরিণের কাঠ-বাঁধানো মাথা ছিল, সেইগুলো দেখিয়ে দিলেন। আমি আর গৌরদাস বোকা হয়ে এ-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলুম। গৌরদাস শুধু বললে, মিছিমিছি আমাদের ভোগালেন স্যার। ও আমাদের বাউণ্ডারী নয়। ইন্‌জিনিয়ার টু দি উডের এলাকা। কাঠ মিস্তিরিকে খবর দিন।

গেট থেকে বেরিয়ে বললে, কাণ্ডটা দেখলিস্? কি চক্কর মাইরি। সেরেফ না-হোক হায়রানি করলে। আমাদের দর্জিপাড়া হলে ওর নাকে চরকা কেটে দিতুম।

সময়ের মত উপশমকারী মলম আর নেই। প্রেমের মত অমন নাছোড়বান্দা টানের রশিতেও সময়ে জল লাগলে ঢিলে ঢলঢলে হয়ে যায়। আমারও ভরসা ছিল ওই সময়। ভেবেছিলুম কোন রকমে সময়টা অতিবাহিত করতে পারলেই হয়। ভেবেছিলুম—শারীরিক কষ্ট যত বেশী হত মনের আশাটা

তীব্রতর হত তত যে, কাজটা শিখতে পারলেই তো কেল্লা মার দিয়া। ইলেক্‌ট্রিকের দোকান খুলব একটা, আর মালিকের মত ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে ফোঁপর-দালালি করতে পারলেই, মাস গেলে কোন না দুশ পাঁচশ হাজার রুপিয়া কামিজের জেবে শতরঞ্জ পেতে নাক ডাকাবে। কিন্তু তিন মাস পরে খতেন খুলে দেখি হাজার দেড়েক গুলি ঠোকা ছাড়া ইলেক্‌ট্রিকের কাজের ইলেক্‌টা অবধি শিখিনি—শিখতে দেয় নি। তিন মাস ধরে যে নাক-ঘষা পরিশ্রম করলুম তা একেবারে বেকার হয়ে যাওয়ায় মনে বড় দুঃখ হল। দশ মাস দশ দিন অশেষ গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করে শেষকালে গোবর প্রসব করলে কার মেজাজই বা ঠিক থাকে? তাই একদিন তিন পয়সা মাইনের অমন পাকা চাকরিটাতেও ইস্তফা দিয়ে সট্‌কে পড়লুম।

ফকীরের তগদিরেও বাদশাহী তক্ত মেলে শুনেছি। তবে আমলটা আলাদীনের হলে। এ লালামোহনের কালে ফাটা কপালে পুটিংএর জোড় অচল। তিন মাস ধরে শরীরের ঘামে তরকারি সাঁতলিয়ে নগদা বিদায় পেলুম না চেখেই। কাঠ বেকারিতে আমার হাতে খড়ি হল। দেখতে দেখতে কলকাতা শহরটা বঙ্গোপসাগর হয়ে দাঁড়াল। যেদিকে চাই দরিয়ার দাবড়ানি খাই। এই অকূল সমুদ্রে আমার একমাত্র লাইট হৌস হল গৌরদাস।

গৌরদাস ভরসা দিলে, ঘাবড়াস্ নে, বুঝলিস্? এই চামচামাট্রির খপ্পর থেকে বেরিয়ে গেলি সেরেফ তোর ঠাকুদ্দার ছু বিয়ের পয়ে। নচেৎ এই হাড়হারামি তোর রক্ত পিত্তি বের করে ছাড়তো। আমার কিচ্ছু বুঝতে বাকী নেই। বুঝলিস্? সব ঘাটে সাঁতার কেটে তবে গে কুয়োর জলে নাইছি। তুই ঘাবড়াস্ নে। আমি বরঞ্চ তোর হয়ে কালীতলায় একটা মালা ঝুলিয়ে আসব'খন। একটা কিছু লাগবেই। এখন যা কেটে পড়।

কোথাও কিছু নেই গৌরদাস একদিন হুট করে এসে বললে, চল তোর জন্য টিউশানি ঠিক করেছি। চিন্তা ভাবনাকে

শিকেয় তুলে ছুটলুম কৈলাস বোস স্ট্রীট। নম্বর খুঁজে খুঁজে বাড়ী যখন বের করলুম তখন রাস্তায় গ্যাসবাতিগুলো ঘুম ভেঙে চোখে মুখে জল দিয়ে চা-খাব চা-খাব করতে লেগেছে। এক চুমুক গরম চা গলায় পড়লেই আড়মোড় ভেঙ্গে চোখটাকে ডিউটিতে বসিয়ে দেবে।

ছোটবয়সে প্রায়ই একটা ছবি দেখতুম। নরকের তাবৎ দৃশ্য তাতে আঁকা ছিল। চুরি করা থেকে শুরু করে গুরুপত্নী হরণ পর্যন্ত যমরাজার পেনাল কোডে যত রকম শাস্তির উল্লেখ আছে তার সব কটি "ডিরেক্টর অব পাবলিসিটি কর্তৃক প্রচারিত" ছবির মতোই সেই ছবিখানায় স্থান পেয়েছিল। তার মধ্যে বীভৎসতম সাজা বোধহয় কুম্ভীপাক। যমরাজারই হোক অথবা সেই ছবির আঁকিয়েরই হোক, কল্পনাটা বোধহয় কুম্ভীপাকের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। নচেৎ টিউশনরত এক পাপীর চেহারাও অবশ্যই দেখতে পেতুম। একটা ছবি ছিল, একজন সুদর্শন যুবকের চোখদুটো একটা পাখিতে খুবলে খুবলে তুলে নিচ্ছে। তলায় লেখা ছিল পরস্ত্রীর দিকে চাহিবার সাজা। কিন্তু বড়লোকের মাচার অকালের কুমড়োর মুখোমুখি চেয়ে, দৈনিক ঘণ্টা কয়েক বসে থাকাটা যে কোন গুরুতর পাপের সাজা তা যমরাজার পেনাল-কোড আজও বাতলে উঠতে পারেনি।

হব-হব সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাড়ী

খুঁজে বের করলুম। কত্তা আটহাতি গামছার ঘেরে লাজ লজ্জাটা কোনমতে ঠেকিয়ে ইজিচেয়ারে বসে বসে সটকা টানছেন। গৌরদাস সটান গিয়েই টিপ করে এক লম্বা প্রণাম ঠুকে দিলে। বিপদে পড়ে গেলুম। শেষটায় প্রাণ থাকে মান বাঁচে এমনি ভাবে শিরদাঁড়াটাকে অর্ধবৃত্তাকার করে যামিনী রায়ের ছবির কায়দায় প্রণাম আর নমস্কারের হাফাহাফি এক প্রক্রিয়া সেরে দাঁড়ালুম। বাড়ীঅলা সটকা না থামিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের চাঁদা হে ছোকরারা? চাঁদা? আমি প্রথমটা বুঝে উঠতে পারিনি। গৌরদাসই বললে, আজ্ঞে চাঁদার জন্যে আসিনি স্যর, আপনি মাষ্টারের খোঁজ কচ্ছিলেন তাই আমি একে নিয়ে এসেছি। আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললে, নিন স্যর বোঝাপড়া করে নিন, এঁর ছেলেকেই পড়াতে হবে। তা আপনার ভাবনা নেই, ছাত্তর ভালই হবে।

কত্তার সটকা এবার সত্যিই থেমে গেল। আমাদের দিকে একবার একবার চাইলেন। সে তো চাওয়া নয়, কলমের বেয়াড়া নিবকে সায়েস্তা করবার জন্য যেমন ঝাড়া দিয়ে দিয়ে নিতে হয়, উনিও ঠিক তেমনি দুটো চোখের দৃষ্টিকে যেন দুবার ঝেড়ে নিলেন। তারপর খানিকক্ষণ সটকা টানলেন একটানা। আমরা দুজন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। বসবার ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা একটা আহ্লাদী ছেলের মতো লম্বা সিড়িঙ্গে গলাটা

দুলিয়ে একটানা বকে যেতে লাগল "টক্" "টক্" বল, বল, কথা বল।

কত্তা বললেন, ম্যাট্রিক পাস ম্যাস্টার চাই। সার্টিফিকেট-খানা বুক পকেটে হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠল। কত্তা বললেন, বেশী লেখাপড়া জানা লোক দিয়ে কাজ চলবে না আমার। সব আলুতেই দম রাঁধা যায় যখন, তখন নৈনিতাল কিনে বে-ফয়দা গাঁট গর্চা দিই কেন? ঢোঁক চিপে বোঝালুম গড়িয়ে সড়িয়ে ওই ফ্ল্যাগইস্টিশান পর্যন্তই পৌঁচেছি, এ যাত্রা আর জংশন অব্দি যাওয়া জোটেনি। মনে হল শেষ পর্যন্ত কথাটা বুঝলেন। নড়ে চড়ে বসে সটকাটায় একটা সুখটান মেরে কত্তা বললেন, তবে ওই কথাই রইলো। তুমি ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত রোজ পড়াবে। মাস গেলে সাত টাকা, ব্যস্। বেছে বেছে চুণোপুটিই যখন খালুই-এ তুললুম, দামের কড়িও তামারই দেবো তো। কিন্তু 'লেট' বরদাস্ত করব না। বুঝলে।

খুশী খুশী মনে বেরিয়ে এলুম। সাতটাকা সাতটাকাই সই বুঝলিস্? গৌরদাস দার্শনিকের মতো বললে—ঝুলে তো পড়, পিছু দেখা যায়গা।

ঘড়ির কাঁটার এত গুরুত্ব কে জানতো? ছটা বাজতে না বাজতে হাজির হলুম বাইরে-বসে-সটকাটানার বাড়ী। আমাকে দেখে কত্তার আতান্তর হল না কিছু। পটের গড্ডুরের মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর দাঁড়িয়ে আছি তো

দাঁড়িয়েই আছি। মনের মধ্যে রাশ রাশ চিন্তা ভাবনা বারোয়ারী পূজো মিটে যাবার পর হিসাব নিয়ে মিটিং করবার জন্য মুকিয়েই আছে, নেহাত সেক্রেটারী বউএর অসুখের ছল করে কেটে পড়ায় গলার সুখ মিটিয়ে গাল ঝাড়তে না পেরে নিজেদের মধ্যেই খোঁচাখুচি করে আখড়াই দিয়ে রাখছে। এমন সময় সট্‌কাবাবু মুখ তুললেন, কি চাই? থতমত খেয়ে গেলুম। বললুম, আজ্ঞে আমি মাস্টার। মাস্টার, কিন্তু আমার তো আর মাস্টারের দরকার নেই। ছ্যাঁক করে উঠল মনটা। মনের তপ্ত কড়াইএ যেন পাঁচ ফোড়নের সম্বরা পড়ল। চোখের আকাশে বেতালা ঘুরে বেড়াতে লাগল একখানা প্যাঁচ-কাটা ঘুড়ি। জুয়ো খেলতে গিয়ে দানের পর দান হেরে যাবার পর ফিরে আসবার টিকিটের পয়সা অবধি লোকে বাজি ধরে যে রকম মরিয়া হয়ে, আমিও আমার এলোমেলো ভেস্তে যাওয়া আশাটাকে একত্র কুড়িয়ে বলে ফেললুম, আজ্ঞে কাল যে আসতে বললেন আমাকে। তোমাকে? ও তোমাকেই ঠিক করেছি না কি? সাতটাকা মাইনে? তা বেশ। সুড়ুক সুড়ুক সটকা চলল খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, ম্যাট্রিক পাস করেছ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট বুক পকেটে তখনও ছিল। এক ঝটকায় খুলে ধরলুম সামনে। তিনি তখনও আমার মুখের দিকে চেয়ে সুড়ুক সুড়ুক সটকা টেনে চলেছেন, কি ম্যাট্রিক পাস করেছ? খুশীতে চারগুণ ফুলে

বললুম, এই যে স্যার সার্টিফিকেট। বিরিশি দশ আনার এক নিরেট দাবড় মেরে কত্তা ফের বলে উঠলেন, সার্টিফিকেট দিয়ে আমি কি করব, ধুয়ে জল খাব? ম্যাট্রিক পাস কি না তাই বল না। পাস না করলে যে সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না, এই সাদা কথাটা কত্তার মগজে 'গুলি' ঠুকে গুঁজে দেবার বাসনাটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে বললুম, স্যার, করেছি। কত্তা বললেন, বেশ, আমার ছেলে কেলাস সেবেনে পড়ে। ঘরে গিয়ে বস, ছেলে বেড়াতে গেছে। এলে পাঠিয়ে দোব'খন।

আয়-পয় ভালই বলতে হবে। এত অল্পে ঝামেলার মামলা থেকে বে-কসুর খালাস পেয়ে বিঘ্নবিনাশনের একটা দাঁতে মনে মনেই হাত ঠেকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে নিলুম। তারপর ফোঁড়া-ফাটা সুখটা বগলে করে একটা চেয়ার হাঁকড়ে দবজার ফাতনায় চোখ রেখে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

সময় বয়ে চলল। আফিমের মৌতাতে বুঁদ বিকেলেব চোখ বুঁজে আসতে লাগল। সন্ধ্যেটা ধোঁয়া হয়ে ঘুলঘুলি বেয়ে ঘরের ভেতর সেঁদুতে লাগল। একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকায় শিড়দাঁড়াটা 'ওভার টাইম' দাবি করে দরখাস্ত পেশ করলে। কিন্তু ছাত্তর না পাত্তা। বসে বসে মনেব মাথায় আঙ্গুল ঠুকে চাটিম চাটিম তবলা বাজালুম। হাত ব্যথা হলে অন্য কাজে ভিড়ে গেলুম। চোখ দুটোকে পাউডার পমেটম মাখিয়ে টমটমে করে নিয়ে চললুম। কাজ পেয়ে চোখের কি

ফুর্তি। হেথা যায়, হোথা যায়। ছ্যালে টাঙ্গানো ছুটো অয়েল পেন্টিং। থলথলে ভুঁড়ি, সটকানাটা পুরুষের একখানি, অন্যখানি অন্দর মহলের গিন্নীর নিশ্চয়। কারণ পুরুষ মানুষ আর যেখানেই পারুক খরচা করে আঁকানো ছবিতে শাড়ীর অস্তিত্ব সইবে না। আর কাপড় পরার ধরনটাও স্ত্রীলিঙ্গসূচক। এ ছাড়া ছবিটাকে আর বোঝবার উপায় নেই। টাকা খরচ করে অয়েল পেন্টিং করাইতো বাইরের ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখবার জন্যে। তা বলে অন্দরের লক্ষ্মীর মুখ দেখবে উটকো লোক, তাও কি হয়! সতীধর্মের ভয় নেই। দাও ঘোমটা দিয়ে মুখখানা ঢেকে। এর জন্যে যদি একটু বেশী মজুরি লাগে তো লাগুক। ও হরি! শিল্পীও তো বাইরের লোক। তবে আর গাঁট-গর্চা দিয়ে লাভ কি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওর সামনে ঘোমটা দিয়েই দাঁড়াও। আরেক ছ্যালে রামকৃষ্ণ পরমহংস সৌম্য হাসি নিয়ে পাশের ছ্যালের আলুথালু অগোছালবেশা বিলিতী একটা ছুকরীকে ধমকে দিচ্ছেন, সামলে বস বিটি।

মফস্বলের কোঠাবাড়ীর ভেতরের ছাতগুলোর যেন ছ্যাকরা-টানা ঘোড়ার হাল। হাড় পাঁজরা বার করা। তাতে আর কিছু না হোক অন্তত এটুকু সুবিধে যে কড়িকাঠ গুণে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেয়া যায়। এ বাড়িটায় সে সুযোগও নেই। কারিগরির গুণে সিলিংটা পলেস্তারা করে ল্যাপা-পোঁছা। যেন নাদুস নুদুস থলথলে মাংসে কণ্ঠা ঢাকা মেয়েটি।

ছাত্তরের প্রতীক্ষা করতে করতে বিরক্তি ধরে গেল। শেষ পর্যন্ত বিরক্তিও ছানা কেটে গেল। এল উপায়হীন অবসন্নতা। চেয়ারে বসে ঝিমুতে লাগলুম। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা কাঠঠোকরা হয়ে আমার মগজে ঠোঁট ঠুকতে লাগল ঠক্ ঠক্। বিলিতী ছবির ছুকরী মেমটা ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল বলনাচের জুৎসই সঙ্গী হিসেবে কাকে পছন্দ করা যায়। মেমটার ভাব সাব দেখে ঘোমটা টানা গিন্নী সটকাটানা ভুঁড়েল কত্তাকে চোখ রাঙ্গিয়ে চাপা স্বরে কড়কে দিলেন, ও কী! এ বয়সেও ছোঁক ছোঁক গেল না। চোখ বুঁজে থাক। আর সব দেখে শুনে ঠাকুর কড়া-ময়ানের হাসিটাকে ঠোঁটের ভিয়েনে চাপিয়ে মৃদু জ্বালে পাক করতে করতে বললেন, ব্যাটারা ছবির ফ্রেমে মনটাকেও আটকে রাখিসনে। সে কথা শুনে পলেস্তারা ঢাকা কড়িকাঠগুলো মশমশ শব্দ করে পাশ ফিরে ফিরে শুতে লাগল।

কই বাবা, কোথায় ম্যাস্টর? মশমশ শব্দ করে বাচ্চা বরগা কড়িকাঠকেই জিজ্ঞেস করলে কি? না তো। চোখ মেলে চেয়ে দেখি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক থাণ্ডার মার্কা জোয়ানমদ্দ। একুশ বাইশ বছর বয়েস হবে নির্ঘাত। মোটা মোটা হাত পা, ইয়া লম্বা এস্থা চওড়া, ফরসা টকটকে রঙ, চোমরানো গোঁফ। পরনে কোঁচানো ফিনফিনে ধুতি, মাটি অবধি লুটিয়ে আছে কোঁচা। গিলে করা আদ্দির

পাঞ্জাবি নিচু থেকে আণ্ডারওয়ার আর গেঞ্জিও যেন ওদের মালিকের সঙ্গে অবাক্ হবার রেসে পাল্লা দিয়ে মুখ বার করে আমাকে দেখে নিচ্ছে। আমি একনজর দেখে নিয়ে বললুম, দেখুন অনেকক্ষণ বসে আছি, পড়ুয়ার তো পাত্তা নেই, দয়া করে তাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন কি ? মন্দ আমাকে একবার দেখে নিলে, তারপর পকেট থেকে একটা ভুরভুরে গন্ধওলা রুমাল বার করে মুখ ঘাড় মুছে নিয়ে সামনে বসে পড়ল। ভাবলুম, বোধহয় ভাইকে পাঠাবার আগে দাদা একটু চেখে নিতে চায়। নড়ে চড়ে বসলুম। অভ্যাসবশে গোঁফে তা দিতে দিতে তারপর এক সময়ে বললে, আজ্ঞে আমিই পড়ব। আপনি আর একটু বসুন, ঝপ করে কাপড়টা বদলেই আসছি। কখন যে চলে গেল, তার হিসেব আর রাখিনি। রাখবার হুঁশও ছিল না। সমগ্র পৃথিবী গায়ের জোরে আমাকে পাক দিতে শুরু করেছে। ঘড়ির টং টং আওয়াজে সংবিৎ ফিরে পেলুম।

সেদিনের মতো আমার ডিউটি শেষ। সেদিন কেন, বোধ হয় সর্বদিনের মতই। লম্বা পা চালিয়ে দিলুম রাস্তা মুখো। বারান্দায় তখনও সটকা ডেকে চলেছে। আমাকে দেখে মুহূর্তের জন্য আওয়াজটা জিরেন পেল। তারপর আবার শুরু হল অক্লান্ত ডাক—সুড়ুক সুড়ুক। গলির মোড় অবধি সে শব্দ আমাকে পৌঁছে দিলে।

সব বিত্তান্ত গৌরদাসকে বললুম পরদিন তুপুরে। শেষ-কালে বললুম, ভাই গৌরদাস! অন্যত্তর চেষ্টা ছ্যাখ্। ও আমার দ্বারা পোষাবে না। ঐরাবতকে শাসন করবে নেংটি? তুই বলিস্ কি! ওকে দেখেই আমার হৃৎপিণ্ড জমে গেছে। গুলো পাকিয়ে হাঁকাড় মারলেই ধাত ছেড়ে যাবে। গৌরদাস শান্ত ভাবে সব শুনলে। তারপর বললে, আমি কদ্দূর লেখাপড়া করেছি জানিস্? জানতুম না। বললে, কেলাস এইটের ঝংকাঠে পেন্নাম ঠুকে বিদ্যের পাট রপ্তানি করে দিইছি। সেই আমি যদি চারমাস ম্যাট্রিকের ছাত্তরকে পড়াতে পারি তো তুই পারবিনে কেন? পেল্লায় দেহ! আরে ওর বাপের অগাধ পোসা, ও শরীর বাগাবে না তো তুই বাগাবি? থাক না ওর শরীর ওর কাছে। তুই যাবি, পড়াবি, চলে আসবি। তবে হ্যাঁ তোকে কতকগুলো কায়দা শিখিয়ে দিই। আমার গুরুদেব বলেছিলেন, বেড়াল যদি কাটতে হয় তবে প্রথম রাত্তিরেই। বেড়াল কাটার গল্প জানিস্? জানালুম, না।

গৌরদাস বললে, তবে শোন্। এক বাদশার ছিল তুই খাণ্ডারনী মেয়ে। অ্যাসা ইয়ে মাইরি তারা যে, পুরুষলোককে তুচক্ষে দেখতে পারত না। তাদের ধারণা পুরুষগুলো কুঁড়ের বাদশা। কাজে কম্মে অষ্টরম্ভা, কিন্তু কথার বেলায়, ফোড়ন কাটতে বাঘা ওস্তাদ। আমরা রাঁধি, ওরা খায়। আমরা বিছানা পেতে দি, ওরা শোয়। কোন কাজ না করে দিলে

যাদের সব অচল, তারা কি না আমাদের উপর তম্বি চালায়। যা শালা। পুরুষ মানুষকে আর কোন কাজে ডাকা হবে না। এমন কি বিয়ে শাদীতেও না। এমনি করে তো কিছুদিন গেল। কিন্তু তাতেও পুরুষমানুষগুলো জব্দ হল না দেখে রাগে ওদের গা কস্ কস্ করতে লাগল। তারপর তো দুবোনে মাইরি পরামর্শ করে এক আচ্ছা ফন্দী বাতলালে। ঘোষণা করে দিলে যে তারা বিয়ে করতে চায়, কিন্তু এক শর্তে। শর্তটা এই যে, বাদশাজাদীরা যাদেরকে বিয়ে করবে তাদের রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একশটা করে পয়জার খেতে হবে। বাদশার মেয়েকে বিয়ে তো সবাই করতে চায়, কিন্তু পয়জার খাবার শর্ত শুনে সবাই পিছিয়ে পড়ে। এখন, সেই শহরে ছিল দুটো লোক, দুভাই, বেজায় গরীব। ছোট ভাই বড়দাকে বললে, চল দাদা তাল ঠুকে দিই, যা থাকে বরাতে। দাদা বললে, বুদ্ধু পয়জারের কথাটা কি ভুলে গেলি? ছোট-ভাই বললে, পয়জার কি এখনও আমরা খাচ্ছি না, খোদার পয়জার? বরঞ্চ রাতদিন খাচ্ছি। আর ওখানে না হয় সকাল বেলা উঠে মানুষের পয়জার খাব। তারপর বাকী দিনরাত তো আমরা তামাম দুনিয়ার মালিক। আর হাজার হোক, বউই তো হবে। চাই কি আশনাইটা জমে গেলে মাফও করে দিতে পারে। ইত্যাকার বোলচাল দিয়ে দাদাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে নিল। চুক্তিনামায় দস্তখত করে বাদশার জামাই বনে গেল।

দুই বোনের দুমহল্লা একটু তফাত তফাত। পাঁচদিন যেতে না যেতেই বড় ভাই একদিন ছোটর মহল্লায় হাজির। ছোট দেখলে দাদার গা-গতর বেলুন-চোপসা হয়ে গেছে। মাথায় যে অমন খাসা বাবরি ছিল সেটা কোথায় উড়ে গেছে। এখন সেখানে টাকের আলমগিরি। বড় দেখলে ছোটর হাল দিব্যি বহাল। সর্ব শরীরে জলপাই-এর চেকনাই। মাথার বাবরি যেন নওল-ঘাসের চাপড়াখান। ছোট বড়কে শুধুলে, কি দাদা, খবরাখবর ভাল? বড় আছড়ে পড়লে, ভাই রে আর বাঁচিনে। তোর বৌদি পাঁচদিনে নখানা নতুন পয়জার ছিঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু তুই? তোর চেহারায় এমন জলুস কেন? ছোট বললে, আমাকে পয়জার খেতে হয় না। পয়জার খাসনে! বড় ফুঁসে উঠল। কেন, চুক্তি করিস্‌নি? দস্তখত দিস্‌নি চুক্তিনামায়? নেমকহারামি কচ্ছিস্? ইমানের দাম রাখলি না? ছোট থাবা মেরে বড়কে থামিয়ে বললে, আরে দূর, সবটা না শুনেই ব্যাজর ব্যাজর করে। তোমার বউমা না মারলে আমি কি সেধে মার খেতে যাব। বৌমা মারে না! বড়র চোখ গোটা আষ্টেক ডিগবাজি খেয়ে শান্ত হল। ক্যায়া তাজ্জব! ছোট মিটিমিটি হেসে বললে, সাধ করে কি আর মারে না। অ্যাসা কায়দা করলুম যে, তারপর আমি না ডাকলে কাছে আসে তার সাধ্য কি? বড় হন্যে হয়ে বললে, তবে আমাকেও শিখিয়ে দে সেই কায়দা ভাই, জান-প্রাণ একত্তর

রাখি। ছোট বলে, তুমি কি পারবে? আচ্ছা শোনো। সেদিন বিয়ে-শাদী চুকলে আমাকে তো অন্দরে নিয়ে চব্য-চোষ্য খেতে দিলে। খানিক পরে কোত্থেকে দেখি একটা মোটাসোটা বেড়াল এসে পাতের কোলে ঘুরঘুর করছে। সেটা আবার তোমার বৌমার খুব প্যায়ারের। আমার কাছে আসতেই আমি তলোয়ার খুলে এক কোপেই ঘ্যাঁচ। দু আধখানা করে দিলুম। তোমার বৌমা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে বললে, আমার বেড়াল কাটলে কেন? আমি নিশ্চিন্ত মনে তলোয়ার থেকে রক্ত পুঁছতে পুঁছতে বললুম, ছাখ কোনরকম অসহ্য বরদাস্ত করতে পারিনে। আমি খুব বদরাগী লোক। তারপরও বিনা এত্তেলায় তোমার বউমা কাছে এগুবে? শাবাশ, শাবাশ। ঠিক। বড় বললে, তবে আজ আমিও বেড়াল কাটব। বড় ভাই চলে গেল। কিন্তু পরদিন খুব সকালেই হাঁড়ির হাল চেহারা নিয়ে এসে হাজির। ছোট শুধুলে, কি ব্যাপার? বড় ভেবড়ি ছেড়ে দিলে, আমিও কাল বেড়াল কাটলুম। তোর বউদি আসতে আমিও বললুম, কোনরকম অশৈলে বরদাস্ত করতে পারিনে। বেজায় বদরাগী লোক আমি। তোর বউদি গুম মেরে রইল। ভাবলুম আপদ কাটল। আজ সকালে উঠে গুনে গুনে পাঁচশ পয়জার মারলে। তাও আবার বেছে বেছে দারোয়ানের কড়া নাগরা দিয়ে। বললে, ইয়ারকী করার জায়গা পাও না? বদরাগ দেখাতে এসেছ! পাঁচদিন পয়জার খেয়েও

যে পুরুষ ভেড়ুয়ার মতন থাকে সে বদরাগী! ছোট বললে, জানতুম! বেড়াল যদি মারতেই হয় তবে প্রথম রাত্তিরেই।

গৌরদাস গল্প শেষ করে বললে, তোকেও বেড়াল মারতে হবে প্রথম রাত্তিরেই। বুঝলিস্? তোকে একটা মন্তর শিখিয়ে দিই। যে মন্তরে আমার ম্যাট্রিক কেলাসের ছাত্তরটাকে জুজু করে রেখেছিলুম। শতকরা আটানব্বুইটা বাঙালীর ছেলে অঙ্ককে ভয় খায়। আর শতকরা নিরানব্বুইটা ছেলে সংস্কৃত জানে না। ব্যস্, এর পরেও আর বেশী বলতে হবে? আর বলতে হত না। বাকীটুকু সমঝে নেবার মত বুদ্ধি মহাপ্রভুই মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

ছ'টা বাজতে না বাজতে ইষ্টমন্তর ঝালিয়ে নিয়ে হাজির হলুম। সটকা মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার ডাকতে লাগল। ভেতরে গিয়ে চেয়ারে বসলুম। খানিকপরে ছাত্তর আসার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা তড়পে উঠল। চাপা ধমক দিয়ে তাকে শায়েস্তা করে নিলুম। বললুম, অঙ্ক কদ্দূর হয়েছে দেখি। কি আঁক কষ? চোরা চাউনি চালিয়ে বুঝলুম গৌরদাস ধন্বন্তরি। চোমরানো গোঁফ এরই মধ্যে নেতিয়ে পড়েছে। এবার দিলুম মোক্ষম দাওয়াই। সংস্কৃত বই কোথায়? উপক্রমণিকা কই? আকারান্ত শব্দ পড়া হয়েছে? বল দেখি হাহা শব্দের দ্বিতীয়া। জানো না? হাহা শব্দটাই তো সংস্কৃত শাস্তরে কুলীন। ওটা ঠিক ঠাক উচ্চারণ করতে পারলেই আদ্ধেক রাস্তা মেরে

দিলে। আর বাকী আদ্ধেক তো সিমেণ্টের। গড়গড় করে চলে যাবে। কাল হাহা শব্দ তৈরী চাই।

কেল্লা তো কেল্লা, এই অস্তর দিয়ে গোটা সাম্রাজ্য জয় করা যায়। সেদিন যখন বেরিয়ে এলুম ছাত্তর আমার মাইডিয়ার হয়ে গেছে। সাতদিনের ভেতরই একেবারে রসজমা জমে গেলুম ছাত্তরের সঙ্গে। গুরু-শিষ্যের সংকোচের যে আড়ালটা মুখে ফিরিয়ে কল্কে টানছিল হপ্তা পার হতে না হতেই তা ভেঙে একেবারে ময়দান হয়ে গেল।

এখন কে কার কাছ থেকে পাঠ নেয়। ছাত্তরের জ্ঞানের পরিধি দেখে নিজের ওপরই ঘেন্না ধরতে লাগল। কতটুকুই বা জানি? সারেঙ্গীর বোল মনের কোন্ পর্দায় কখন তান তোলে আর এসরাজ কেন বনেদী আসরে কল্কে পায় না, এ-সব তত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা থামগুলোর জানবার নয়। ইতিহাস শুধু সেন, পাল, মোঘল পাঠান রাজা বাদশাদের নিয়েই তৈরী হয়নি, এটা জানলুম সেদিন, ছাত্তরটি যেদিন লক্ষ্ণৌয়ের কনীজ বাঈজীর ইতিহাস শোনালে। বললে, কুলীনদের মধ্যেও যেমন উঁচু নিচু থাকে, তেমনি বাঈজীদের মধ্যেও। আর কনীজ হল বাঈজী কুলে নৈকুষ্যি কুলীন। ওটা একটা টাইটেল হয়ে গেছে জানেন। অবশ্যি এসব আপনার বোঝবার কথা নয়। সরস্বতীর আসবার কথা আছে দুচারদিনের ভেতর। যদি আসে একবার চাক্ষুষ করে নেবেন। নিয়ে যাব'খন।

আলোচনা শেষ হয় না। টঙাটং আটটা বেজে যায়। আমার ডিউটি শেষ। আমি উঠে পড়ি। বাইরে আসতেই সটকাটানার সঙ্গে মোলাকাত হয়। আমাকে দেখেই সটকাটা মুহূর্তের জন্য থামে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সুড়ুক সুড়ুক শব্দ বের হয়, আমি ততক্ষণে রাস্তায়। রোজই এমন।

কলকাতায় বৃষ্টি নামলে একেবারে যমের দক্ষিণ দোরের পাশ পি টি ও নিয়ে বসে। আর বৃষ্টিও যেন সার্কাসের তালিমে রপ্ত হয়ে ঝুন মেরে গেছে। সারাক্ষণ ঘরে বসে আছি, বৃষ্টির নাম গন্ধও নেই। কিন্তু কাজে কর্মে বেরিয়েছি কি ঝুপুর ঝুপুর এক পশলা ভিজে ন্যাতা বুলিয়ে দিলে। মহা ঝঞ্ঝাট। সে-দিন একটু সকাল সকালই বেরিয়েছি। আগে ভাগে খবরটা পাব বলে। সরস্বতী বাঈ কনীজের আসবার কথা। তা কি ছাই এগুতে পারছি। দু এক পা যেতে না যেতেই পশলা পশলা বৃষ্টি এসে ঢুঁ মারছে। আবার ঢুকে পড়ছি গাড়ী বারান্দায়। বৃষ্টি একটু কমছে কি আবার বাইরে বেরুচ্ছি। ছাতার কারবার কোম জন্মেও ছিল না। গরুভেজা ভিজতে ভিজতে তো কোন রকমে ছাত্তরের বাড়ী পৌঁছলুম। আমাকে দেখেই সটকাটা থামল। পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকছিলুম, সটকাটানা জিজ্ঞেস করলে কটা বাজে? চেয়ে দেখলুম, ছ'টা বেজে আঠারো মিনিট হয়েছে। আমতা আমতা

করে বললুম, আজ্ঞে বেজায় বিষ্টি পড়ছিল। কথাটা শেষ করতে পারলুম না, খেলুম এক বাগদাই দাবড়ি। কটা বেজেছে? বললুম, ছ'টা বেজে গেছে। কটা বেজেছে? আবার প্রশ্ন হল। বললুম, ছ'টা বেজে আঠারো মিনিট! ক' মিনিট লেট? এবার মরিয়া মেকুর হয়ে রুখে দাঁড়ালুম। বললুম, আঠারো মিনিট লেট। কি চুক্তি ছিল তোমার সঙ্গে? বললুম, ছটায় হাজরে দেবার। দিয়েছ ছটায় হাজরে? আজ্ঞে এ তাবৎ দিয়ে এসেছি। আজকে এসেছ ছ'টায়? না। চুক্তিমত কাজ করেছ? না। এবার সটকা চলল একটানা কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে একনজর চাইলেন। বললুম, তাহলে মোদ্দা সিদ্ধান্তটা কী হল। খানিকটা সটকা টানলেন, খানিকটা আমার দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, কাল থেকে তোমাকে আসতে হবে না।

শেষ! চোখের তারায় ভেসে উঠল অজস্র সরষেফুল প্রসেশন করে তারাদের পানে চলেছে। না না। আকাশের বাজারে আজ নিলেম হচ্ছে। থরে থরে বারকোশে সাজানো রয়েছে ডাঁই করা পুরানো তারারা। চেঁচামেচি ডাকাডাকির অন্ত নেই, অর্থ নেই। শুধু একটা গোলমাল তাল গোল পাকিয়ে পাগলা বয়ারের মতো এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বড় বড় নিরেট শিং নিয়ে আমার দিকে ছুটে এলো। বড় বড় লাল চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।

তারপর সর্বশরীরের ওজন দিয়ে আমার মগজে ঢুঁ মারলে। ঢস্ করে করে একটা আওয়াজ হল। আওয়াজটা কথা হল। শেষ। চাকরি শেষ।

ধীর পায়ে নেমে এলুম। কৈলাস বসু স্ট্রীট দিয়ে সার্কুলার রোড্ মুখো এগুতে লাগলুম। অজস্র হতাশা তখন কয়লার ধোঁয়া হয়ে কলকাতাটাকে আষ্টে পৃষ্ঠে গিলে ফেলছে।

এবারে যখন কলকাতায় পদার্পণ করলুম সর্ববিষয়ে লায়েক হতে আর অল্পই বাকী। চোস্ত জবান রপ্ত হয়েছে আর ছত্রিশ দরজায় ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে গতর মন পোক্ত ঝান্নু হয়ে গেছে।

সময়টা আবার এমন, শক্ত করে হাল ধরতে না পারলে ঘূর্ণির চক্করে বিনি পয়সায় ঘোল খেয়ে নিতে হয়। যুদ্ধের শুরুর কথাই বলছি। তামাম দুনিয়ার মানুষ যেন আর মানুষ নেই। কোনো এক রূপকথার দৈত্যের ফুসমন্তরে দুটো লড়ুয়ে মুরগী বনে ও একে ঠোকরাতে শুরু করেছে। দূর বিদেশের লোক, কোনোদিন চর্মচাক্ষুষ না করলেও আমাদের চেনা দরিয়ার কূলে কূলে বা'চ খেলে বেড়াচ্ছে। চেম্বারলেন, চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনী, তোজো অপরিচয়ের চেগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আর গলা খাঁকারি দেয় না। সকল আগল ঠেলে পরিচয়ের অন্দরমহলে হুট করে প্রবেশ করে মাসি পিসির দেওর ভাশুরের মতোই।

লড়াই-এর খেল পড়তে বেশ মুখরোচক, ফিলিমে দেখতে আরো মজা। যতক্ষণ না নিজের স্কন্ধে আগুনের আঁচ লাগছে

ততক্ষণ আর ভয় কিসের। আঁচ লাগা দূরে থাক ধোঁয়ার উদ্যোগ দেখেই কলকাতার লোক সুট সুট করে সরতে আরম্ভ করলে। কাছের দূরের পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ঢুঁ মারতে লাগল। আর সে পাড়াগাঁ যত অজ হয়, বনবাদাড়ে ভরাভর্তি হয় ততই 'সেফ'। বোম্বারীর চোখ আড়াল-কানা। গাছ লতা পাতায় সহজেই ভোলানো যায়। ধুমসো ধুমসো মেয়েগুলোর কি ফুর্তি। চক্ষু মেলা অবধি তো ইট কাঠ লোহালক্কড় ছাড়া আর কিছু দেখেনি। ফাঁকার মধ্যে কালেভদ্রে সমারোহ করে গড়ের মাঠ, জলের মধ্যে ঢাকুরে লেক, আর শোভার মধ্যে টবের ফুল। এই তো মজুত পুঁজি। কিন্তু একি, ফাঁকা ফাঁকা—ফাঁকা। গাছ গাছালির কার্নিভাল। ঘরে আটকা মেয়েগুলো যেন বৃষ্টি পাওয়া কৈ মাছ হয়ে উঠল। তিড়িং তিড়িং উজোন যায়। এটা পাড়ে ওটা ছেঁড়ে, আর 'লাভলি' 'ওয়াণ্ডারফুল'এর ঘায়ে গইগামিনদের মূর্ছা যাবার দশা হয়। পুরুষগুলো হাটে বাজারে ঘোরে। ঝুড়ি ঝুড়ি তরি-তরকারী দেখে, আর আত্মহারা হয়ে পড়ে। বাবুদের গদগদ অবস্থা, ঢুলু ঢুলু চোখের ভাব দেখে গাঁয়ের খপিশ ব্যবসাদার মুখের বোকা বোকা ভাবটাকে তাজা রেখেই পাঁচগুণ দাম বাড়িয়ে দেয়। তাই সই, এক ডাঁই পুঁই ডাঁটা হাতে ঝুলিয়ে বাবুটি "ড্যাঞ্চিপ্" "ড্যাঞ্চিপ্" করতে করতে বাড়ী ঢোকেন। বাবুর শব্দ পেয়ে চর্বিফোলা গিন্নী পাতিহংসীর মতো হেলতে দুলতে আসেন। কাচ্চা বাচ্চারা পিঁক পিঁক

করে চারপাশে জড়ো হয়। দাম দর শুনিয়ে জেতবার আনন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে কুলকুচো করে ছেড়ে দ্যান। পুঁইঅলা বাজারে বসে খালি ঝুড়িটার দিকে চেয়ে পয়সাভরা গামছাটার খুঁটটা নাড়তে থাকে।

গ্রাম মফস্বল যখন আমদানি করা প্রাণ প্রাচুর্যে কদিনের মতো উজ্জ্বল উচ্ছল তখন কলকাতা? কলকাতার যেন একাদশী। বেশ মোটা সোটা ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপসী গিন্নীর যেন সদ্য পতি-বিয়োগ হয়েছে। কান্না থেমে এখন থমথমে ভাব। অনভ্যস্ত উপোসে তার শুকনো ফরসা মুখখানার মতোই লাগছে কলকাতাকে। রাতের কলকাতা নিবু নিবু। রাস্তার বাতি-গুলোর সে ফাজিল চোখের ড্যাবা ড্যাবা চাউনি নিশ্চিহ্ন। একটু বেচাল বেসামাল হতে যাচ্ছিল বোধ হয়। গুরুজনের ধমক খেয়ে এখন ঘেরাটোপের আড়ালে মুখ লুকিয়ে লজ্জা ঢাকছে। আর কলকাতার ঝড়তি পড়তি বাসিন্দেরা দিন কাটাচ্ছে আকাশচক্ষু হয়ে। অর্থাৎ এক চোখ সদা সর্বদা আকাশে নিশান করে বাকীটা দিয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি সরকারী দপ্তরখানার অথর্ব চোখ দুটোও ঘুম ভেঙে, তুড়ি মেরে, হাই তুলে, আড়মোড়া ছেড়ে, পিঁচুটি মুছতে লেগে গেছে। হাওয়াই হামলার হাত থেকে বাঁচবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। খোলা হয়েছে এ. আর. পি. দপ্তর। চলতি কথায় যাকে আমরা "এবার রক্ষা পাও" বলতুম।

বিজ্ঞাপন দেখে ভর্তি হবার আফিসে হাজির হলুম ভোরের ডিম ভাল করে না ভাঙতে। লোয়ার চিৎপুর রোডটা বৌবাজার স্ট্রীটকে একটা ছোট্ট ডিঙি মেরে টপকে যেখানে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট্ বনে গেছে, ডান হাতে লালবাজার বেটন উঁচিয়ে খাড়া, আর সামনে সার সার চীনেদের 'নলম জুতির' দোকান, ভর্তি হবার আফিসটা সেইখানে। রিক্রুটিং আফিসের বেঞ্চে বসে এদিক সেদিক চাইছি। একজন ডাক দিলেন, এই দাদা, শুনছেন ? ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, ঢিলে ঢালা কোট প্যাণ্টালুন পরা, আমার থেকে বিঘতখানেক লম্বা আর হিচিং কালো, বয়েস বোঝা ভার—একটা ছোকরা। এগিয়ে গেলুম। বললে, যদি সিগ্রেট ফিগ্রেট তু' একটা থাকে ঝাড়ুন তো সস্তা করে। বললুম, তুঃখিত স্যর। আমার পিঠে এক থাপ্পড় ঠুকে দিয়ে বললে, কি মশায় সক্কাল বেলা বউনি খারাপ করে ছ্যান। সারাটা দিন ট্যাক খসিয়ে নেশা জমাতে হবে নাকি। মাইরি আমার এসব আদপেই পছন্দ নয়। চলুন চলুন, বাইরে যাই। দোকান থেকে কিনেই দিন না হয়। একেবারে গ্যাস করে দেবেন না দিনটাকে। এক কথায় ভাল লেগে গেল ওকে। নির্বান্ধব পুরীতে যেন স্যাঙাতের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলুম। হৃদ্যতার রশিটা থেকে আগুন ধরিয়ে সিগারেটটায় শেষটান মেরে যখন ফেলে দিলুম ছুঁড়ে, ততক্ষণ হাড়নক্ষত্রের পরিচয় পেয়ে গেছি ক্রিস্টোফার ভৌমিকের। ছোকরা দিশী ক্রীশ্চান !

ক্রিস্টোফার বললে, দেখুন ব্যাটাদের কাণ্ড। বলেছিল আটটায় আসতে, তাই সাত সকালে হুড়োহুড়ি করে এলুম। কিন্তু কত্তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, এগারোটার আগে আসবেন না।

কি আর বলি। চুপচাপ দেখে যেতে লাগলুম কাণ্ড কারখানা। হল ঘরটা লোকে লোকে ভরে গেল। ছত্রিশ জাতের আমদানি হয়েছে। প্রত্যেকের চাপা ফিস্‌ফিসানি একটা জমাট আওয়াজে পরিণত হয়েছে। কাঁহাতক আর চুপ করে বসে থাকা যায়! এদিক-সেদিক ঘুরতে ফিরতে লাগলুম। চামড়ার গন্ধঠাসা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট। আফিস কারবারের খাসমহল ডালহৌসী, লালবাজার, রাধাবাজার, পোলক স্ট্রীট, মিশন রো। ঘুরে ঘুরে পায়ের মাস্‌ল্ ব্যথা হয়ে গেলে এক কাপ চা খেয়ে রিক্রুটিং আফিসে ঢুকে দেখি সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে সার বেঁধে। তাড়াতাড়ি করে আমরাও সারবন্দী হয়ে পড়লুম। ভৌমিক এক ফিরিঙ্গী ছোকরার পা মাড়িয়ে দিলে। এই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হল। তারপর এক সময় 'সরি' বলে বচসাটা ঈশ্বরকে সমর্পণ করে যখন উভয়পক্ষ শান্তি ঘোষণা করলে, তখন আমরা একটা ঠেলা-দরজাঅলা কামরার সামনে পৌঁছে গেছি।

ফিরিঙ্গী ছোকরাটি আগেই ঢুকেছিল। খানিকটা পরে মুখ-চোখ রাঙা করমচাপানা করে বেরিয়ে এল। নাক ঝেড়ে

ভৌমিককে যা বললে, তার খাস বঙ্গার্থ হচ্ছে, অফিসারটি একটি বিরাট ডাব। যা জিজ্ঞাসা কর, একটাই মাত্র জবাব পাবে: সে সব কিছু এখনও ঠিক হয়নি, পরে জানতে পারবে। নাম-ধাম সব লিখিয়ে এলুম বটে, ইনটারভিউও দিলুম, কিন্তু কিসের জন্যে, চাকরিটার স্বরূপ কি, ভাই, তা বুঝতে পারলুম না। ভৌমিক কিছু মন্তব্য করবার আগেই তুজনের ডাক এল। কপালটাতে হাত ঠেকিয়ে ঢুকে পড়লুম।

চেয়ার হাঁকড়ে বসে আছেন একজন আধবয়সী 'অফিসর'। সূচলো গোঁফ আর উঁচুছাঁট জুলপি দেখে শৌখিন বলে মালুম হয়। মস্ত বড় টেবিল। টেবিলে গাদা করা ফাইল, নাম ভর্তির ফরম। একটা ছোকরা কেরানী পাশে বসে নিরন্তর লিখে চলেছে। একটা টেলিফোন কেরানী আর অফিসারের আড়াল রচনা করেছে। আমাদের তুজনকে দেখে নিলেন বেশ করে। তারপর ভৌমিককে প্রথম ডাকলেন, টেকনিক্যাল কাজ জানা আছে কিছু? জবাব দেবার বদলে ভৌমিক যা করলে দেখে তো আমার পিত্তি বরফ-জমা জমে গেল। ফস্ করে পকেট থেকে একখানা খবরের কাগজ টেনে বার করে অফিসারটির সামনে মেলে ধরলে। তারপর গম্ভীরসে বললে, আটটার সময় আসতে বলেছিলেন, দেখছি তো প্রায় এগারোটা বাজে। ভুলটা কাগজের না গাফিলতিটা আপনার, বলবেন কি দয়া করে? আচমকা মোটরের হর্ণ শুনে পেছনে লাফ দিতে গিয়ে রেলের

সিটি শুনলে ভ্যাড়াছাগলরা যেমন ভাবে তাকায়, অফিসারটির চোখে কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই চাউনি প্রত্যক্ষ করলুম। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলেন তিনি। অফিসারের গাম্ভীর্য নিয়ে বলে উঠলেন, তোমার কাছে সে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। একগাল মাইডিয়ারী হাসি ছেড়ে ভৌমিক বললে, সে তো জানিই স্যর, দেবেন না সে তো জানা কথা। যাক সে কথা, আপনার একখানা চিঠি ছিল, দিয়ে কেটে পড়ি। পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে দিলে। চিঠিখানায় চোখ বুলিয়েই অফিসারের মেজাজ পালটে গেল। বললে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন। যেন এটা সে আগেই জানতো এমনিভাবে একটা চেয়ারে বসে আমার দিকে চেয়ে অফিসারের স্বরটাকেই গলায় তুলে বললে, তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস্। বুঝলুম, যে কোন কারণেই হোক অফিসারটিকে কায়দায় পাওয়া গেছে। তবে আর পরোয়া কোন্ ঘোড়ার ডিমের। ঝপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লুম!

ভৌমিক জিজ্ঞাসা করলে, চাকরিটা স্যর কি জাতীয়? অফিসারটি আমতা আমতা করলেন খানিকক্ষণ। কেরানীটাকে ধমকে দু-চারটে ফাইল-পত্তর আনিয়ে পাতা ওল্টালেন। দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, দেখুন দফ্তরটা হালে খোলা হয়েছে। আপনারাই হবেন প্রথম রিক্রুট। বিলেত থেকে এক্সপার্ট আনানো হচ্ছে, তা শুনেছি। ডিপার্টমেণ্টের নাম

হচ্ছে এ. আর. পি. রেস্কিউ সার্ভিস্। ব্যস্, এর বেশী আমি আর কিছু জানিনে। আমাদের উপর অর্ডার আছে বিভিন্ন টেকনি-ক্যাল কাজে পারদর্শী লোক রিক্রুট করবার। তা আপনি কি চান? মানে কি ধরনের কাজ আপনার পছন্দ? ভৌমিক প্রশ্ন শুনে একটুও ভাবলে না, অতিশয় সিরিয়াসভাবে বললে, রিক্রুটিং অফিসারের কাজটাই স্যর আমাদের ভাল আসে, কি বলিস্। ঘাড় নেড়ে চটপট সমর্থন করলুম। ভৌমিক বললে, তা সব্বাইকে তো আর ও পদটা দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই স্যর আপনার যা খুশী। আমি মোটর মেকানিক। অফিসারটি আমার দিকে চাইছেন দেখে বললুম, আমি ফিটার। তারপর ছু'জনে সার্টিফিকেট দেখালুম। অফিসারটি খুশী হলেন মনে হল। কেরানীটি নাম, ধাম, ধর্ম, বয়েস, বাপের পরিচয় লিখে নিলে। অফিসারটি বললেন, দয়া করে আধঘণ্টাটাক বাইরে অপেক্ষা করুন, কার্ড দেবো এবং কি করতে হবে তাও বলে দেবো। ছু'জনে নমস্কার করে বেরিয়ে এলুম।

তোর চিঠিটায় কি ছিল রে? ঘরের মধ্যে আমাকে আচমকা তুই বলা ইস্তক সেটা ভৌমিককে ফিরিয়ে দেবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছিলুম। তাই তুই তোকারী আমিও শুরু করে দিলুম। আমার মুখ থেকে প্রশ্নটা শুনেই ভৌমিক খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমিও ঠাঁয় ওর চোখে চোখ রেখে মৃত্থ মৃত্থ হাসতে লাগলুম। ভৌমিকও একগাল হেসে

বললে, তবে তাই। হাত মিলা দোস্ত। হাতে হাত মিলিয়ে কষে গোটা কতক ঝাঁকানি দিয়ে বললে, ওটা একটা সুপারিশ পত্র। এ. আর. পি.রই একজন ডেপুটি কণ্ট্রোলারের। এ খ্রীষ্টানের বাচ্চার কাছে পেয়াঁজী চলবে না বাবা।

বাসখানা তৈরী হয়েছিল বোধ হয় মান্ধাতার পিতার আমলে। লক্কড় ঝক্কড় করতে করতে হাড় পাঁজরাগুলোকে আপসে এধার ওধার করে যখন নামিয়ে দিলে তখন আর চোখ মেলে যাচাই করবার অবসর নেই যে কোথায় এলুম। তাছাড়া এ তল্লাটে আজকেই আমার পয়লা পদার্পণ। ড্রাইভারের কাছ থেকে মাল নামাতে গিয়ে দেখি এক শ ঝামেলা। ওইটুকু ফোঁকরের মধ্যে ত্রিসংসারের সমুদয় প্যাঁটরা বস্তা ঝুড়ি খন্তা শাবল জড়ো করে রেখেছে। আমার স্যুটকেসটার কোন পাত্তা নেই। বিছানার ল্যাজটুকু এক ফাঁকে দেখতে পেয়ে যাহাতক টান মারা আর যাবে কোথায়, ঝনাঝন দুটো ক্যানেস্তারা গড়িয়ে পড়ল শিরদাঁড়ার ওপর। যন্ত্রণায় মন তখন বৃন্দাবন যাবার জন্যে হাওড়ায় গিয়ে টিকিট ঘরের সামনে 'ভাঁজা' ন্যায় আর কি ? বাসে ওদিকে দেখলুম দিব্যি স্টার্ট দেওয়া হয়ে গেছে। অমনি চিল্লা-চিল্লি শুরু করলুম, এই ড্রাইভার, অ্যাই কনডাক্টর, আমার মাল নামিয়ে দাও। চেল্লানির চোটে কনডাক্টরের কানের পোকা বোধ হয় পাশ ফিরে বসল। হেলতে দুলতে মহারাজ এগিয়ে এলেন। তারপর চোখ মুখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ হ্যায় তুমহারা সামান, তোমার মাল কই ?

আরে মাল দেখতে পেলে তো আমিই নামাতে পারতুম। বেরুনো ল্যাজটুকু দেখিয়ে বললুম, এই তো বিছানা, কিন্তু স্যুটকেসটা তো দেখতে পাচ্ছিনে। কনডাক্টর এক হ্যাঁচকায় বিছানাটার প্রায় বারোটা বাজিয়ে রাস্তার উপর ধপাস করে ফেলে দিলে। ওদিকে দেখি স্যুটকেসটা একটা কোণা বের করে ফিক ফিক উঁকি মারছে। বললুম, ওই তো আমার স্যুটকেস। নিকলে দাও কনডাক্টরজী। বাস ওদিকে স্টার্ট নিয়ে অধৈর্য হয়ে ভরস্ ভরস্ নাক ঝাড়ছে। এক হ্যাঁচকায় তেমনি ভাবে আমার সাধের স্যুটকেসটিও ফুটপাথশায়ী হলো। কনডাক্টর বাসের গা চাপড়ে একটা বাজখাঁই 'চ—লো' বলতেই বাসটা আমার নাকের ওপর ধোঁয়ার নিঃশ্বাস ছেড়ে কোমর নড়াতে নড়াতে কেটে পড়ল।

এদিক সেদিক চেয়ে একজনকে পাকড়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দাদা, জজকোর্টটা কোনখানে? চোখ ছুটোকে তৃতীয় নেত্র করে ভদ্রলোক বললেন, জ-অ-জ, কোর্ট! সে এখানে কোথা মশাই? সিধে এগিয়ে যান নাক বরাবর। ফার্লংটাক এগুলেই পেয়ে যাবেন বলে অঙ্গুলটাকে যেদিকে নির্দেশ করলে সেই দিকেই মাজা নড়া বাসখানা একটু আগে চলে গেল। বেহ্মা চক্কর আর কাকে বলে? শুনলুম জায়গাটার নাম গোপালনগর। বাঁদিকে চেতলার রাস্তা, ডানদিকে এগুলেই আলীপুর কালেক্টরী। যেদিকে মুখ ফিরে দাঁড়ালুম তার

পিছনেই কালীঘাট চেতলার পুল, রাস্তার এক পাশে আলীপুর জেল, প্রেসিডেন্সী জেল, অন্য পাশে বাঙ্গলা সরকারের ছাপাখানা, মাথার উপরে সর্বসাধারণের খাস তালুকের আকাশ আর পায়ের নীচে কর্পোরেশনের কুচকুচে পিচঢালা ডোঙ্গাপিঠ রাস্তা। ব্যস্, একনিঃশ্বাসে ভূগোল আউড়ে গেলুম। তা ছাড়া করণীয়ই বা কী? ওই স্যুটকেস আর বিছানার বাণ্ডিল বয়ে এক ফার্লং তো দূরের কথা, এক পা নড়বার সাধ্য আমার নেই। এদিকে সকাল বেড়ে চলেছে। আমার ওয়ারেণ্টে লেখা আছে সাড়ে ছ'টার মধ্যে গিয়ে হাজরে দিতে হবে। রাগটা একেবারে চড়াক করে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠোক্কর খেল। মনে মনে ড্রাইভার, কনডাক্টর, বাসের মালিক, ইস্তক বডি বিল্ডার আর তাদের উর্ধ্বতন এবং অধস্তন চোদ্দপুরুষকে পাঁচমিনিট ধরে লাথি, কিল, ঘুঁষি মেরে আর জব্দ করবার সম্ভব অসম্ভব যত রকম কায়দাকানুন আমার জানা ছিল একে একে ব্যবহার করে কিছুটা ঠাণ্ডা হলুম। কটা বাজল কে জানে? ঠুন ঠুন রিক্সা যাচ্ছিল, ডেকে মালপত্তর তুলে গদীয়ান হয়ে বসে হুকুম করলুম, চলো জজেস্ কোর্ট। রিক্সা চলছে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে আমার রাগটাও একটু একটু গলছে।

আলীপুরের মতো জায়গা হয় না। ইট কাঠ পাথর আর ঘাস গাছগাছালির এখানে জড়াজড়ি গলাগলি। একটা অন্যটাকে নিত্যি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে। ইট কাঠ কংক্রীট

যদি নতুন বৌ তবে গাছগাছালি যেন সন্থ বিয়ে হওয়া ছোট ননদ। একজনের সঙ্গে অন্যের হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, আছে অনাবিল ভাব। এমনটি সারা কলকাতার আর কোথাও দেখিনি। বড় বড় কড়ুইগাছ দু'একটা ঝাউ কি অশ্বত্থ প্রশান্ত মেজাজে খাড়া। রাস্তার উপর রোদ পড়ে কি ছায়া পড়ে তারই নিরন্তর রেষারেষি। দেখতে দেখতে চলছিলুম। হঠাৎ এক দিকে চোখ পড়তেই থ মেরে গেলুম। সকালের রোদটা এসে যেন ওর কানে কানে বলেছে, তোমায় বড্ড ভালবাসি, আর তাই কৃষ্ণচূড়াটা লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ নামিয়ে বলছে, যাঃ!

নম্বরটা পাঁচিলের গায়ে ঝুলতে দেখেই নেমে পড়লুম। ভাড়া চুকিয়ে গেট ঠেলতেই নেপালী দারোয়ানটা বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, পাস? এ পকেট সে পকেট খুঁজে ওয়ারেণ্টখানা বের করে দেখালুম। একটা খটাস সালাম ঠুকে বললে, ঠিক হ্যায়। ঢুকে পড়লুম। চেয়ে দেখি যে যেখানে ছিল একটা বাজখাঁই হাঁকড়ানি শুনে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সার দিতে লেগেছে। দারোয়ান আমাকে বললে, জলদি, ফলিন মে যাইয়ে। বুঝলুম আর না বুঝলুম বিছানা পত্তর ওখানে রেখেই উর্ধ্বশ্বাসে দিলুম ছুট। গায়ে গায়ে লেগে সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবই অন্‌খা অজানা লোক। চোখ দুটোকে এদিকে ওদিকে চালাতেই মাঝামাঝি জায়গায় ভৌমিককে দেখেই দিলুম আর এক ছুট।

গুঁতোগুঁতি করে ঢুকতে যাব, ভৌমিক বলে উঠল, মরলে রে, ভ্যাড়ার বাচ্চাটা মরলে।

ওর মুখের দিকে চাইব এমন সময় শুনলুম, এ গদ্ধেকে বাচ্চে ইধার আ। ওরে গাধার ব্যাটা, এদিকে আয়। চোখ ফিরিয়ে দেখি ইয়া লাশ এক বুড়ো পাঁইয়াজি, বোধ হয় হাবিলদার হবেন, আমাকে আপ্যায়িত করে ডাকছেন। মিলিটারী পোশাকে ওঁর সর্বাঙ্গ মোড়া, পাকা দাড়িতে মেহেদি ঘষে ঘষে হলদে করে রেখেছেন। গুটি গুটি এগিয়ে গেলুম ওর দিকে। এমন ভাবে আমার দিকে চাইলেন, যেন একটা বেহদ্দ আজব চীজ দেখছেন। তারপর গর্জে উঠলেন, 'টেনশন'! ছাত্তরবয়েসে কিছুদিন স্কাউটিং করেছিলুম। ভাবে সাবে ঠাহর করলুম, এটেনশন। দুপা জোড়া করে বুক চিতিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ালুম। 'স্ট্যাণ্ডারিজ' আবার গর্জন। ততক্ষণে আমার জ্ঞানের আঁখি পাখা মেলে ধরেছে বুঝলুম 'স্ট্যাণ্ড অ্যাট্ ইজ'। পা ফাঁক করে হাত পেছনে দিয়ে দাঁড়ালুম। 'টেনশন'! হুকুম হল। তামিল করলুম। 'স্ট্যাণ্ডারিজ'। তামিল করলুম। ভাবলুম এবার বোধ হয় নিষ্কৃতি। কিন্তু মানবচরিত্রের অল্পই জেনেছি। সর্দারজী সহজে নিরস্ত হবার পাত্তর নন। সমানে চলতে লাগল 'টেনশন' 'স্ট্যাণ্ডারিজ'। দশবার, পনরোবার, বিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ, তারপর গুলিয়ে ফেললুম। কিন্তু ধন্য রে কুচকাওয়াজের মহিমা! হাত পা থরথর করে কাঁপছে। পেটের ভেতর

কোত্থেকে একটা ব্যথা ঢুকে মাথা দিয়ে ঢুস্ ঢুস্ গুঁতো মেরে মেরে অস্থির করে দিচ্ছে। কিন্তু তবুও হুকুম শোনবা মাত্র হাত পা মাথা সব ঠিকঠাক জায়গামত আসা যাওয়া করছে। গুলতির ইটের মত 'টেনশন' আর 'স্ট্যাণ্ডারিজ' কথাদুটো দুই কানে খট খট ঠোক্কর মারতে যা দেরি।

অবশেষে সর্দারজী রেহাই দিলেন। তখনকার মত শেষবার 'টেনশন' হলুম। সর্দারজী বললেন, মেরা বাত ঠিকসে শুনো, মেরা বাত ঠিকসে মানেগা তো আচ্ছা হোগা, নেহিতো হালুয়া খারাব হো যায়েগা। আমার কথা মন দিয়ে শোন। যদি আমার কথা ঠিকঠাক মেনে চলিস্ তো ভালই, নচেৎ হালুয়া খারাপ হয়ে যাবে। বুঝলুম না সর্দারী হালুয়াটা কি চীজ। তবুও সর্দারজী যখন হাঁকাড় মারলেন, সমঝা—বুঝলি? ঘাড়টা আমার তোয়াক্কা না রেখেই সায় দিয়ে দিলে। সর্দারজী আবার শুরু করলেন, যারা পয়লা আসবে তারা ডানদিকে দাঁড়াবে, যারা পরে আসবে তারা বাঁ দিকে দাঁড়াবে। বলেই হাঁকাড় দিলেন, সমঝা? না সমঝে আর উপায় কি? তখন, সেই মুহূর্তে সর্দারী ধমকের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হতে লাগল এ দুনিয়ায় আর এমন বস্তু নেই যা আমার অজানা, যা সমঝের অণুমাত্র বাইরে। সর্দারজী বললেন, লাইনে গিয়ে দাঁড়া, কিন্তু মনে রাখিস্, আমার কথা যদি ঠিকঠাক মেনে চলিস্ তো ভালোই, নচেৎ হালুয়া খারাপ হয়ে যাবে তা বলে দিচ্ছি।

বুঝলি? হালুয়া সম্বন্ধে মনে মনে একরাশ দুশ্চিন্তা জমা করে সারবন্দী হয়ে সহজ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম।

খুঁজে বেছে তো ঘর একখানা কোন রকমে যোগাড় হল। সুটকেস বিছানা তার মধ্যে রেখে বার হলুম বাড়ীটার হুদ্দো চৌহদ্দির তল্লাশ নিতে। ঘর থেকে বেরিয়ে ভৌমিক বেশ করে চারদিক চেয়ে নিলে। তারপর বললে, এটা বোধ হয় আস্তাবল ছিল রে। সত্যিই, বেশ হদিশ করে আমারও যেন তাই মনে হতে লাগল। একতলা নীচু ঘর, ঢালু চৌকাঠহীন মেঝে। আর বড় ঠেলা পাল্লার দরজা। হয় গ্যারেজ, নয় আস্তাবল। যা হয় হোক, তবুও এ ঘরখানাই ভাল।

এটা ছিল জাপানী দূতাবাস। এখন আমাদের, রেস্‌কিউ সার্ভিসের লোকদের হেড্ কোয়ার্টার, ট্রেনিং সেণ্টারও বটে। মস্ত বড় আঙ্গিনাঅলা একটা তেতলা বাড়ী। সেইটেই আমাদের আফিস আর তার আশে পাশে আঙ্গিনার দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে আস্তাবল, গ্যারেজ, রান্নাঘর, চাকর দারোয়ানদের থাকবার যে কুঠরীগুলো তাইতে থাকব আমরা। আপাতত বললেন একজন কত্তাব্যক্তি।

ভৌমিক দেখে শুনে বললে, ঘোলালে মাইরি, থাকব কি করে। ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাব যে। চ একটু ঘুরে টুরে দেখে নি।

বলব আর কি। আমার আক্কেল অনেক আগেই ফায়ার

হয়ে গেছে। আশাটাকে বগলে মুড়ে তুজনে ঘুরে এলুম চাদ্দিক। সন্ধ্যের মুখোমুখি একটা হোটেল থেকে খেয়ে ফিরলুম আস্তানায়। দেরি করতে ভরসা হল না। অনথা জায়গার নিয়মকানুন তো জানিনে।

জজকোর্ট রোডে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। কোর্টের মাঠটা আড়াআড়ি পাড়ি দিতে দিতে দেখলুম চেতলার রাস্তা ডিঙিয়ে চাঁদখানা উঠছে। সেই আবছা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট মনে হল এই কোর্টের বুড়ো বিল্ডিংটা যেন ছেয়ে রঙের লোম লোম সন্ধ্যের আলোয়ান গায়ে দিয়ে আরাম করে বসে এই প্রথম পোষের শীতটাকে আলবোলার ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছে।

বাইরে থেকে দেখলুম ঘরে আলো জ্বলছে। চমকে উঠলুম। আলো জ্বাললে কে? ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি দিব্যি আর একজন ঢুকে বসে আছে। বেশ টকটকে রঙ। আমাদের মতই বয়েসে। ফিরিঙ্গী বলেই মনে হল। আমরা ঢুকতেই উঠে এসে ও বললে, কিছু মনে কর না দোস্ত, নিতান্ত নাচার হয়েই তোমাদের দ্বারস্থ হয়েছি। আর আর ঘরগুলোতে তো থাকবার যো নেই। এইটাই যা একটু পদের। এখানে আমাকেও ভাই, দয়া করে একটু ঠাঁই দিতে হবে। বলে এগিয়ে এসে করমর্দন করে বললে, আমি অ্যালবার্ট এডোয়ার্ড ডলবি, তোমাদের সঙ্গেও পরিচিত হতে চাই। আমি আর ভৌমিক পরিচয় বললুম। ছোকরা বেশ আদব-কায়দা তুরস্ত। অমায়িক।

একটু লাজুক। ওর বাবা রেস বুলেটিনের প্রকাশক। বোন টাইপিস্টের কাজ করে। ওদের বাসা ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে। হিজ মাষ্টার ভয়েসে নিজে রেফ্রিজেটার মেকানিকের কাজ করত। মুনিবের সঙ্গে ঝগড়া করে সে কাজ ছেড়েছে। আর বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে এ. আর. পি.তে নাক ঘষতে এসেছে।

ভোর বেলা যথারীতি ছুঘণ্টা ধরে কুচকাওয়াজ। হাবিলদার লাল সিংএর দাপট ছাড়া ভাববার দেখবার শোনবার তাবৎ কিছুতে তালা মেরে আমরা আমাদের শরীরের ঘামে ময়দান নোনা করে দিই।

এই উল্লু বদন সিধা। ঝুকো মাৎ। টেন্‌শন্‌। আজ্‌বর। নেই হুয়া। ঠিকসে মেরা বাত শুনো···খেয়াল করে কথাগুলো শোন, নচেৎ হালুয়া বের করে ছাড়ব। পায়ের সঙ্গে পা মেলা, থুতনির সঙ্গে থুতনি। বেঁকিস্‌ নে, ঝুঁকিস্‌ নে। স্ট্যাণ্ডারিজ। হল না। আবার। হাবিলদার লাল সিংএর ফাটা কাঁসর আওয়াজ ছুটো ঘণ্টা এইমত চলে। পা মেলাতে আমাদের ঘাড় হিলে যায়, বুক সিধে রাখতে পা ফাঁক হয়ে যায় আর তত লাল সিংএর দাপানি বাড়ে। ছুঘণ্টা পর লাল সিংএর সুমধুর আদেশ শোনা যায়, অথবা ঐ আওয়াজকেই সুমধুর বলে মনে হয়। টেনশন, স্ট্যাণ্ডারিজ। আজবর। টেনশন, স্ট্যাণ্ডারিজ। বাথ্‌রাইট নাম্বার (বাই দি রাইট নাম্বার)। আমরা বলতে

থাকি এক দুই তিন চার পাঁচ···দশ···কুড়ি···। তারপর শোনা যায়, প্লেটুন ডিসমিস। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ি। একটা গাছতলা খুঁজে নিয়ে চিতপাত হয়ে শুয়ে শুয়ে কুকুরের মত হাঁপাতে থাকি।

লড়াই নয়, তবু লড়ুয়ে লড়ুয়ে ভাব। বেশ লাগে। মনে পড়ে, যখন খুব ছোট, গেঁয়ো পণ্ডিতের পাঠশালায় বেত খেয়ে পোক্ত হচ্ছি, সেই সময় একটা ছেলে এসে ভর্তি হয়েছিল আমাদের সঙ্গে, নাম তাল ঠোকা টেঁপা। কারো সঙ্গে বচসা কি ঝগড়াঝাঁটি হলেই টেঁপা তেরীয়া হয়ে দাঁড়াতো। আর হাত পা ছুঁড়ে এন্তার চিল্লাতো, আয় কে বাপের ব্যাটা আছিস্ একবার দেখি, লড় দেখি আট হাত দূর থেকে। তখন বুঝতুম না, বিক্রম দেখেই হাওয়া দিতুম। আমাদের এই এ. আর. পি.র তোড়জোড় দেখে সমস্তটাই সেই তালঠোকা টেঁপার ব্যাপার বলে মনে হল। মনে হল আগাগোড়া ব্যাপারটাই আট হাত দূর থেকে কুস্তি লড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

ট্যাঁক ক্রমশই ফাঁকা হতে লাগল, খাওয়ার বরাদ্দ কমাতে কমাতে সেদিন সকালে এক কাপ চা আর দুখানা বিস্কুট খেয়েই পকেটের সব জঞ্জাল একেবারে সাফ করে দেওয়া হল।

খালি পেটে দুঘণ্টা প্যারেডের ধকল সহ্য করা অসম্ভব। প্যারেডের পর সবাই চলে গেল স্নান খাওয়া করতে। আমাদের তিন জনের আজকে আর সে ঝঞ্ঝাট ছিল না। চিতপাত

পড়ে রইলুম একটা গাছের ছায়ায়। কোন কিছু ভাবছিলুম না, কিছু চিন্তা করছিলুম না। ভৌমিক বললে, দূর শালা, হিঁদু হয়ে তুই মুখ গোঁজ করে পড়ে আছিস্ কেন? তোর তো একটা হিল্লে হয়েই আছে, যত কষ্ট শালা আমাদের খৃষ্টানদের, যত না খাওয়ার কষ্ট মাইরি। বললুম, আমার বাবার বন্দোবস্তটা কি হল?

ভৌমিক বললে, কেন, তুই তো হিঁদু, তোর একাদশী করলেই চলে। না খেয়ে তো আর থাকতে হল না। কথাটা বলেই এমন ভাবে আমার দিকে চাইলে যেন আমার সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষায় ওর বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ওর ভাবসাব দেখে হেসে ফেললুম। ডলবি ব্যাচারা বাংলা বোঝে না, হঠাৎ মাঝখান থেকে জিজ্ঞাসা করে বসলে, anything humourous? (হাসির ব্যাপার বুঝি)? ভৌমিক ঘাড় নেড়ে জানালে, হুঁ। ব্যস্ ওইটুকুই যথেষ্ট, হো হো করে ডলবি এমন হাসতে থাকল যেন রসিকতাটুকু ওর সঙ্গেই এতক্ষণ করা হচ্ছিল।

ডলবির ব্যাপারটাই এই রকম, সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকে, আমরাও পারতপক্ষে বাংলা ছাড়া বলিনে। ব্যাচারা প্রাণপণে চেষ্টা করে আমাদের আলোচনা থেকে রস পাবার। আমাদের হাসির ভাগ দুঃখের ভাগ থেকে ও আলাদা থাকতে চায় না কিছুতেই। তাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, ওটা কি রসিকতা, যদি রসিকতা হয় তবে জোর হাসবে। আর যদি শোনে যে ব্যাপারটা দুঃখের, খুব করুণ, সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ ছল ছল করে

উঠবে, আর বলবে, most sc ry, most sorry, (খুবই দুঃখিত, বড্ডই পরিতাপ)।

ভৌমিকের হাতে অনেকবার এই নিয়ে ব্যাচারা নাহক নাজেহাল হয়েছে। একবার একটা বাংলা ছবি দেখতে গিয়েছিলুম। একটা করুণ দৃশ্য ডলবি বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ ভৌমিকের আস্তিন টেনে জিজ্ঞাসা করলে, anything humourous? ভৌমিক বদমাশি করে বললে, হ্যাঁ। আর যাবে কোথায়? হো হো করে হল ফাটিয়ে হেসে উঠল ডলবি। হলে তখন লোকজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সগু কাঁদতে শুরু করেছিল, এমন সময় বেরসিকের মতো হাসিটা ওদের করুণ করুণ ভাবটার উপর মই চালিয়ে যেন ঢ্যাড়স বুনে দিল, হলের তাবৎ লোক ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো শিং উঁচিয়ে, ধর শালাকে, মার হারামীর বাচ্চাটাকে, করে তেড়ে আসবার উপক্রম করতেই আমরা অন্ধকারে সুট সুট পিট্টান দিলুম।

চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছিলুম। চোখের উপর একটা ছায়া পড়ল। চেয়ে দেখলুম ফজলে করিম। ভর্তি হয়েছে হালে। সিড়িঙ্গে তালগাছের মত লম্বা, মাথায় কাবলে ছাঁট বাবরি। আমাকে চাইতে দেখে বললে, কি হে সাঙাতরা বড় যে চুপচাপ, নাস্তা করবে না? ওদিকে যে টাইম হয়ে এল।

খিধেটাকে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়ে পাড়িয়ে রেখেছিলুম, ফজলে করিমের কথা শুনে তিড়বিড় করে দামাল ছেলেটির মতো জেগে উঠে বেপরোয়া খামচাখামচি করতে শুরু করলে। ভৌমিক বললে, যাও তো বাপধন, নিজের বুটে কালি দাও গে যাও, আমাদের নাস্তা তৈরি হচ্ছে।

খপ্ করে বসে পড়ল ফজলে করিম। সোজাসুজি বললে, ছ্যাখ্, বয়েসটা খরচা করেছি নিতান্ত কম নয়। আমার কাছেও পেঁয়াজী? নাস্তা তৈরি হচ্ছে! হুঁ! বাদশার রসুইখানা খোলা রয়েছে তোমাদের নাস্তা বানাবার জন্যে! মোদ্দা ব্যাপারটা কি হে দোস্ত তাই বল না। কি? তবিয়ত ঠিক নেই? পোসা নেই?

এর পরে কি বলা যায় ভেবে পাচ্ছিনে। ফজলে করিম বলে উঠল, আরে আমারও তো ও কর্মটা সারা হয় নি। চলনা, এক সঙ্গেই ঝামেলাটা চুকিয়ে আসি। ভৌমিক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, ঠিক হ্যায়। চল।

জজকোর্টের পিছনেই একটা এঁদো হোটেল। ঢুকতে যেতেই দুর্গন্ধে আমার কাটা জন্মনাড়ীটা ইস্তক ঘুলিয়ে উঠল। ওদের কোন রকম ভাবান্তর দেখলুম না। চাটগেঁয়ে হোটেলঅলা একটা বেঞ্চি এগিয়ে দিতেই বসে পড়লুম।

কথায় বার্তায় অন্তরের অন্দরে ঢুকে যেতে লাগলুম ফজলে করিমের। খুবই অমায়িক লোক। ওর ঠাকুদ্দা ছিলেন পাঠান, মেওয়াঅলা। বিয়ে করেছিলেন এক বিহারী মেয়েকে। ওর

বাপ বিয়ে করেছিলেন এক আধা · াঙ্গালী বহরমপুরী মেয়েকে, নিজে এখনও বিয়ে করেনি। তবে আশনাই চালাচ্ছে মামাতো বোনের সঙ্গে। বলতে বলতে গদগদ হয়ে গেল। বললে, মাইরি মহাব্বৎ করতে চাও তো 'বাঙ্গালীন্ কা সাথ'। দুচার কথা বলতে না বলতেই গান ধরে দিলে উর্দুতে। তর্জমা করলে অর্থটা দাঁড়ায় ঃ

ওরে প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ
আমার দিল জ্বালিয়ে করেছি খাক্
তাইতে সুর্মা করেছি পাক
চোখে লাগাও চোখে লাগাও
চোখে লাগাও মেহেরবান।

ডলবি জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি? ওকে বললুম, রসিকতা নয়, সিরিয়স, রীতিমত প্রেমের ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত ফজলে করিম এসে আস্তানা গাড়লে আমাদের পাশের কামরাটাতে। ব্যস্, নরক একেবারে গুলজার। ঘুমকে প্রায় তালাক দিয়ে ফেললুম। রাতের পর রাত কাবার হতে থাকল ফজলের মুখে ওর আশনাইএর কিস্সা শুনে শুনে।

মেয়েটির নাম মোতি, বড় মোতি। ওরা দুবোন। বছর খানেকের ছোট বড়। ছোটর নাম ছোট মোতি, ইস্কুলে পড়ে ক্লাস নাইনে। যেমনি খুবসুরত তেমনি বিছে বদমাশ। ওদের আশনাইএর আগুন ওইতো ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে রেখেছে।

তবে বড় মোতি আগুন নয়। রোশনাইএর আভা। আহা সে হাসলে মুক্তো ঝরে পড়ে। গোলাব হেসে উঠে খুসবু ছড়ায়। কাঁদলে মোতি ঝরে। আশমান পানি ঝরায়।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল ছিল না। ফজলে করিমের বর্ণনায় আমরা চাঁদের আলোর বেলুনে চড়ে তারায় তারায় ফেরি মারছিলুম। অন্ধকারের তা দেখে বুঝি আর সহ্য হল না। হুমো হুমো মুখখানা বাড়িয়ে এস্তা চীৎকার দিলে যে আমাদের ভাবের বেলুন ছ্যাঁদা হয়ে চুব্‌সে গেল। ধপাস করে আছড়ে মাটিতে পড়লুম।

চেল্লানির দাপটে আমাদের মৌজের ঘোর কেটে খান খান হয়ে গেল। কি ব্যাপার? কে, কে চেল্লায়? কোত্থেকে চেল্লাচ্ছে? ছ্যাখ ছ্যাখ করতে করতে বেরিয়ে পড়লুম।

আমাদের ঘরের পেছনে ছিল এক ঘোড়ার আস্তাবল। মাঝে মাঝে একটা সাহেবকে তদবির তদারক করতে দেখতুম। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলুম ও ঘোড়াগুলো রেসের। ভৌমিক বলতো রসের।

গিয়ে দেখলুম আস্তাবলের দরজা বন্ধ। ভেতরে ধপধপ দাপাদাপি হচ্ছে আর সেই বিকট চেল্লানি। আমরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। কি করব বুঝতে না পেরে দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করলুম। ব্যস্ মন্ত্রের মত কাজ হল। সব চীৎকার মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। কিন্তু সব কিছু একেবারে নিশ্চুপ। জজকোর্টের সাদা বিল্ডিংটা যেন দাঁত বার করে বলছে, যাও বাবা সকল, ঢের হয়েছে। এখন চোখের পাতা দুটো এক করোগে দিকিনি।

ফিরে এসে যার যার বিছানায় ঢুকে পড়লুম।

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত একটা রহস্য হয়ে দাঁড়াল। আছি আছি বেশ আছি সারাদিন। সন্ধ্যেটাও বেশ জমজমাট কাটে। রাত ক্রমেই ভারী হয়। আমাদের গলা বুঁজে আসতে থাকে। আড্ডা ঢিলে হয়ে পড়ে। আর দূরের কোন একটা পর্তুগীজ গির্জের ঘড়িতে টং টং করে বারটার ঘণ্টা বেজে ওঠে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ যায়। আর তারপরই—ওঃ সে কী চীৎকার। পিলেতে লিভারেতে ঠোকাঠুকি লেগে যায় একেবারে। একটা প্রকাণ্ড একচোখো দৈত্য যেন ঘুমিয়ে ছিল। কে তার চোখে আঙ্গুলের খোঁচা মেরে দিয়েছে। আমরা পাঁচিল টপকে আস্তাবলের দরজায় গিয়ে ঘা মারি, আবার অমনি সব চুপ হয়ে যায়।

কিন্তু শেষতক সবাই মরিয়া হয়ে উঠলুম। এ রহস্য ভেদ করতেই হবে যা থাকে কপালে। কোত্থেকে এক ভবঘুরে উত্তেজনা আমাদের সবার শরীরে ভুর ভুর করতে লাগল। আমি, ডলবি ভৌমিক আর ফজলে করিম অন্য জগতের বাসিন্দা বনে গেলুম। অশরীরী রহস্যটা আমাদের সঙ্গে গোপন অভিসার করতে শুরু করল। ঘোমটা দিয়ে মুখখানা ঢাকা। দেখি দেখি করেও দেখতে পাচ্ছিনে। কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগালের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। ছুঁইছুঁই করেও ছুঁতে পারছিনে। সে এক বেজায় অস্বস্তি।

একদিন সন্ধ্যের মুখোমুখি আস্তাবলটার ভেতরে ঢুকে পড়লুম। বেশ করে ঘুরে ঘুরে দেখলুম। দুটো তাগড়াই ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দানা চিবুচ্ছে। সহিস একটু দূরে খড়টড় কুচিয়ে রাখছে। ঘরের ভেতর একটা হাফ দোতলা মত আছে, সেই খানে শুয়ে শুয়ে আর একটা সহিস ঘুম লাগিয়েছে।

ভৌমিক এগিয়ে গেল নীচের সহিসটার দিকে। তারপর বললে, বেড়ে জায়গাটি বাগিয়েছ ভাই, তা রাত্রে মশা লাগে না ?

লোকটা সন্দিগ্ধভাবে চাইল আমাদের দিকে। জবাব দিলে না। ফজলে করিমের দিকে চোখ টিপে ভৌমিক বললে, বেশ খোলামেলা মাইরি, না। ফাস্‌কেলাস জায়গা।

ডলবি ততক্ষণে তৎপর হয়ে মেঝেতে হাঁটু গেঁড়ে বসে রক্তের দাগ টাগ পাওয়া যায় কি না খুঁজতে শুরু করেছে। আমি আর কি করি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলোকে দেখতে লাগলুম। বেশ তেজী ঘোড়া দুটো। একটা শান্ত তপস্বীর গাম্ভীর্য বাগিয়ে দানাপানি খেয়ে চলেছে। অন্যটার রকম সকম ইতরবিশেষ, একটু ফাজিল, একটু ছনমনে ঠেকল। লোকজন দেখে সেটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এতক্ষণ পরে সহিসটির কাজ শেষ হল। সে ধীরে সুস্থে উঠে হাতটাত মুছে কাপড়টাকে সেঁটে নিলে বেশ করে, তারপর দুটো আঙ্গুল মুখে পুরে দিলে জোর এক সিটি। সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে একটা শব্দ হল ঝপ। আরে বাপরে। ইয়া এক ষণ্ডামার্কা লোক পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ কচলাতে শুরু করেছে। ভয়ে আমার আত্মারাম উড়বো উড়বো করতে শুরু করল।

সহিসটা আমাদের উপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে ষণ্ডাটার কাছে গিয়ে ওকে টেনে একেবারে দরজার কাছে নিয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে কি সব আলোচনা পরামর্শ করলে। অবস্থা দেখে আমরা তো ভ্যাবাচাকা হয়ে গেলুম। তারপর ওরা করলে কি, হঠাৎ বাইরে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ

করে দিলে। আমরা ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দুমদাম ঘা দিতে লাগলুম। চীৎকার শুরু করলুম, এই দরওয়াজা খোল দো। ই ক্যা দিল্লাগী হোতা? কিন্তু কে কার কথা শোনে! শুনতে পেলুম ক্যাঁচ্ করে একটা বড় তালা দরজায় আটকা পড়ল। তারপর শুনলুম, শালালোগ জরুর ডাকু হ্যায়, চল বে সাহাবকা পাশ। তুরন্ত! ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই সবাই মিলে ধপাস করে মেঝের উপর বসে পড়লুম। ভৌমিক হতাশভাবে বলে উঠল, যাস্ শালা, মহা চক্করে পড়ে গেলুম দেখছি।

ধীরে ধীরে অন্ধকারেরা ঘরে ফিরে আসতে শুরু করল। খড়ের র‍্যাকে, দানার চাড়িতে, সিলিংএর কোণে, ঘরের ভেতরকার শূন্যটুকুতে, ঘোড়া দুটোর দেহে, আমাদের মাথায় আফিস ফেরত ক্লান্ত শিথিল ওদের দেহ এলিয়ে দিয়ে আরাম করতে লাগল। ওদের আরামের আমেজ ছোঁয়াচে রোগের মত আমাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

ফজলে করিম পরামর্শ দিলে, চ' হাফ দোতলায় গিয়ে উঠি, ওইটেই ভাল জায়গা। ডলবি উত্তেজিতভাবে সমর্থন জানালে, ঠিক কথা। ওটা আমাদের দুর্গ, ওইখানটাই আত্মরক্ষার সব চাইতে ভাল জায়গা। শোন্, আমাদের চারজনের মধ্যে গোটা রাতটা ভাগ করে নিয়ে পালা করে জাগতে হবে। এক মুহূর্ত অসতর্ক থাকলে চলবে না। শত্রুপক্ষ কখন কি যে করে জানা তো নেই। আঃ এ সময়ে যদি একটা

পিস্তল টিস্তল থাকত! ডলবির আফসোসের আর সীমা থাকে না।

সবাই মিলে উপরে উঠে পড়ি একটা নড়বড়ে বাঁশের মই বেয়ে। উপরে বেশ খানিকটা জায়গা পাওয়া গেল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বিড়িও পাওয়া গেল গোটাকতক, কিন্তু দেশলাই নেই।

ডলবি বললে, আঃ যদি তুটো আতশকাঁচ থাকত আর খানিকটা রোদ, তবে তোর বিড়ি ধরিয়ে দিতুম। ও সব কায়দা ঢের জানা আছে। এই যে পজিশনে আমরা আছি না, এটা খুবই স্ট্র্যাটেজিক। ওরা যদি আসে, ধর বন্দুক কি রিভলবার নিয়ে আসে, ব্যস্ টিপ্ করে ওদের উপর লাফিয়ে পড়্। নাই বা থাকল আমাদের পিস্তল, রিভলবার, হাত তুটো আছে কি করতে? তুটি করে ঘুঁষি, ব্যস্ আর দেখতে হবে না, একেবারে রিঙের বাইরে। তারপর আমার কানে কানে বললে, নিয়মটা শিখে রাখ্, লেফ্‌ট্ টু দি অ্যাবডোমেন, রাইট টু দি জ, তলপেটের বাঁয়ে আর চোয়ালের ডাইনে। যদি তাক মতো ঝাড়তে পারিস তবে আর দেখতে হবে না, সিওর নক্ আউট।

ওর ডানদিকে ছিল ফজলে করিম। দিলে তার পিঠে গদাম করে এক ঘুঁষি ঝেড়ে। ফজলে করিম তো রেগে কাঁই। চেঁচিয়ে উঠল, এই ব্যাটা বাহাতুরের বাচ্চা, হাত পা সামলে রাখতে না পারিস্ তো এক লাথিতে নীচে দেব চালান করে।

উঃ! এক ঘুঁষিতে বদনটা টেঁড়া কবে দিয়েছে। ডলবি লজ্জা পেয়ে গেল খুব। ছেলেটি স্বভাবত খুবই লাজুক! কথাবার্তা কম বলে। অথচ এখন এত ছটফট কবতে শুরু কবেছে যে আমাব সন্দেহ হল ভয় পেযেছে।

ডলবি তোতলাতে লাগল, সবি, সবি, কিছু মনে কবিসনে ভাই। ওব কানে কানে বললুম, একটা ভুলেব দরুণ এবকমটা হয়েছে। ভাবিস নে, ঠিক হযে যাবে। কিছু হবে না। ডলবি শুনে আশ্বস্ত হল। আমাব গায়ে একখানা হাত বেখে পাশেই শুয়ে পড়ল। ঠিকই ধবেছিলুম, ভয় পেযেছিল। বেচাবা খুবই ছেলেমানুষ। বড্ড মমতা হল ওব উপব।

টং টং কবে নটা বাজল। ভৌমিক লাফিয়ে উঠল। বললে, এই ফজলা, ব্যাটা ষাঁড় ঘুমুতে লেগেছে ছাখ্। কি মতলব বল দিকিনি ব্যাটাদেব, সমস্ত বাত এই ইতুব কলে বন্ধ কবে রাখবে নাকি? ওদিকে চাকবিব দফা নট হযে গেল যে। নটার ঘণ্টা বাজল শুনেছিস, নাম ডাকবে আব আধ ঘণ্টা পবে। ফজলে করিম পরম নিশ্চিন্তে বললে, বাজে বক বক কবিস্‌নে। ঘুমিয়ে পড়। যেখানে কোন কিছু কববাব থাকে না সেখানে ঘুমোনোই হচ্ছে একমাত্র কাজ।

ভৌমিক অসহিষ্ণু হয়ে বললে, তোব কি ব্যাটা, বেশোকাঠ কোথাকাব? খিধেও নেই, তেষ্টাও নেই। আড়াই হাত জায়গা পেলেই ভস্ ভস্ ঘুম। এদিকে পেটে যে ছুঁচোয় ডন

মারছে, তার কি ? ভৌমিকের কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললুম, অনেক ছোলা ভিজে আছে, খাবি তো নীচে যা। আর এই ফাঁকে দুটো নিয়েও আসবি আমাদের জন্য। ভৌমিক খুশী হয়ে বললে, বেড়ে বলেছিস্। ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ তুলে বাঁশের লক্কড় সিঁড়িটা বেয়ে নীচে নেমে গেল ভৌমিক।

ভবিষ্যতের ভাবনায় চাবি দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানিনে। অকস্মাৎ ঘুমের সুখদরিয়া থেকে এক হ্যাঁচকাটানে কে যেন শক্ত ডাঙায় আমাকে ছুঁড়ে দিলে। ভূমিকম্পে ঘরখানা ভেঙে পড়ল ? না কি চলতি ট্রেনে ধাক্কা খেলুম ? চোখ চেয়ে দেখি সবাই জেগে গেছে। স্কাইলাইট চুঁয়ে খানিকটা চাঁদের আলো ঢুকে ঘরের অন্ধকারকে কোণঠাসা করেছে। সেই আলোয় দেখা গেল, তখন যে ঘোড়াটাকে নিরীহ গোবেচারা দেখেছিলুম, তিনি এখন রণমূর্তি। চাঁট ছুঁড়ে ছুঁড়ে অন্য ঘোড়াটাকে প্রায় পাট করে ফেলেছে আর মুখ বাড়িয়ে এর ভাগের দানাপানিগুলো খেয়ে নিচ্ছে। আর এ ব্যাচারা চাঁটের চোটে বাপ বাপ বলে আকাশ ফাটানো চীৎকার করছে। ওঃ! সে কী চীৎকার!

আমরা হুড়মুড় করে নেমে গেলুম। আমাদের পায়ের শব্দ পেতেই লড়ুয়ে মূর্তিটা খপ্ করে পকেটে পুরে বেটাচ্ছেলে শান্ত তপস্বীর মত শুয়ে পড়ল। আর সেই বোম্বাই লাথি খেয়ে এ ব্যাচারা ধুঁকতে লাগল।

ফজলে করিম বললে, এতক্ষণে মালুম হল। ওঃ কি হারামী মাইরি। ঢের ঢের হারামী দেখেছি কিন্তু ঘোড়া হারামী এই প্রথম দেখলুম।

বাইরে কথাবার্তার আওয়াজ পেলুম। ক্যাঁচ করে তালা খুলল। মদে চুর এক সাহেব একটা বন্দুক বাগিয়ে প্রথমে ঢুকল। পেছনে সহিস দুটো। এই, হাত উঁচা কর। ইস্‌মে দো টোটা হ্যায়। কাল্লু, তুম যাও। বাঁধো শালালোগোকো। সাহেব যত গড়গড় করে বলে যেতে থাকে আমার জিভ তত শুকিয়ে আসে। ভৌমিক আর ফজলে করিম হিমসিম খেয়ে যায় ওকে বোঝাতে। ডাকু ফাকু নই সাহেব। তোমার লোক দুটো ভুল বুঝেছে। আমরা এ. আর. পি.র লোক। এই আস্তাবল থেকে রোজ রাত্রে বিকট চীৎকার ওঠে। ঘুমুতে পারিনে আমরা। তাই দেখতে এসেছিলুম ব্যাপারটা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সাহেবের মুখে এক কথা। হ্যাণ্ডস্ আপ্। কাল্লু পাকড়ো। বাঁধো। চালান দো বদমাশ-লোগোকো। শেষ পর্যন্ত ডলবি এগিয়ে গেল। সাহেবকে শান্ত করলে। বোঝালে সব ব্যাপারটা। ঘোড়ার গায়ে জখ্‌মির দাগ দেখালে। তখন সাহেব বড় লজ্জিত হল। যাও যাও, শিগ্‌গির ক্যাম্পে যাও। ছি ছি, বড় লজ্জার কথা। শূয়ারের বাচ্চাদের কালকেই বিদায় করব।

ক্যাম্পে ফিরেও তো এই সুখ। আগে জানলে কোন্ বেওকুফের বাচ্চা এখানে ফিরতো। পিঠটান দিতুম কাজে ইস্তফা দিয়ে। কাজের নামে তো লবডঙ্কা। ভোরে উঠে দু'ঘণ্টা ধরে কুচকাওয়াজ কর। কাজ থাকুক না থাকুক, সাজার ব্যাপারে দড় ছিল আমাদের ক্যাম্পটা। কাল যে ফিরিনি ঠিক সময়ে সেটা গেরো দিয়ে রেখেছে। সুযোগ পেয়ে নাক দিয়ে জল বার করে নিলে। একে তো হাওলদার লাল সিং আমাদের প্রথম নজরেই বিষ দেখেছে। ছুতো নাতা পেলেই প্যারেডের সময় পনরো মিনিট আধ ঘণ্টা 'ডবলিং' করিয়ে ছাড়ে। 'ডবলিং' মানে ডবল মার্চ, সাদা বাংলায় দৌড়। সেদিন পুরো দু ঘণ্টা 'ডবলিং' করালে। চচ্চড়ে রোদে সেই ভৈঁসা দৌড় দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জো হল। তবু নিস্তার নেই! লালসিং গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়ে যাচ্ছে। লেফট্ হুইল, রাইট্ হুইল, বাঁয়ে যাও, ডাইনে ঘোরো। ইচ্ছা হল ওর মুণ্ডুটা ফুটবল বানিয়ে খেলি। ওর ছালটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে চেঁছে নিয়ে বাটা নুন ছড়িয়ে দিই। চোখ অন্ধকার হয়ে এল। বুকটা ফেটে বোধ হয় চুর চুর হয়ে গেল। এমন সময় মেঘের ওপার থেকে হুকুম এল, হল্ট্—থামো। "টেনশন"

'স্ট্যাণ্ডারিজ', ডিস্‌মিস্'। দুপা এগিয়ে যেতে গেলুম, পারলুম না। ধপ্ করে ওইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম। কিছুক্ষণ অসাড় পড়ে থেকে মুখ যখন তুললুম তখন কাদের ছায়া আমার মুখের উপর পড়েছে। চোখ চাইতেই ভৌমিক আর ফজলে করিমকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখলুম। ওদের মুখে চোখে বাসা বেঁধে রয়েছে ক্লান্তিভরা এক টুকরো হাসি। বললে, ডলবির নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। ওর মাথায় কয়েক মণ জল ঢেলে দিয়েছি। তোকেও কি তাই করতে হবে? ভৌমিকের কথায় লজ্জা পেলুম। জোর করে উঠলুম। পাছে পড়ে যাই তাই দুবগলের মধ্যে ওরা হাত পুরে দিলে। তিনজনে একটা গাছের ছায়া আশ্রয় করে শুয়ে পড়লুম লম্বা হয়ে।

অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হলুম। ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়াতেই পাঁচিলের ওধারে নজর গেল। সার সার দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ঘোড়া। কালকের দুটো তো আছেই, তাছাড়া আরো। কালো, বাদামী, মেটে, চিতে চিতে, হরেক রকমের। প্রায় দশ বারটা হবে। কি চেকনাই! কি জেল্লা! সূর্য যেন ওদের তেলা পিঠে মুখ দেখে টেরি বাগিয়ে নিচ্ছে। কালরাতের সেই বুড়ো সাহেবই পাইপ মুখে দিয়ে ঘুরে ঘুরে তদারক করছে আর জন চব্বিশেক সহিস দলাই মলাই করতে করতে হাপুস নিঃশ্বাস ফেলছে। কি করতে সাহেবটা এদিকে ফিরতেই ভৌমিক মাথা নুইয়ে গুড মর্ণিং বললে। দেখা দেখি আমিও।

সাহেবটা খুব খুশী হয়ে টুপিতে হাত রেখে পাল্টাই দিলে। তারপর গুটি গুটি হ্যালের কাছে এগিয়ে এসে আলাপ জমাল। আমি টমসন ম্যাক্‌ডুগল। অতবড় নামটা উচ্চারণ করতে যদি তোমাদের বাংলা মুখে ব্যথা ধরে তবে সংক্ষেপে টমি খুড়ো বলো। আমার বাড়ী মেলবোর্ণে। সতরো বছর এ দেশে আছি। করাচীতে পাঁচ, বোম্বাইতে ছয়, কাণপুরে চার আর এইখানে, এই কলকত্তায় দুই। তাহলে ইন টোটল, একুনে দাঁড়াল সতরো। অঙ্কের জ্ঞানটা আমার বড়ই টনটনে। সেই কোন্ বালক বয়েসে, ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে কেঠো বেঞ্চিতে সিধে হয়ে বসে মিস্ ফ্রিজের কাছ থেকে যোগ বিয়োগে প্রথম পাঠ নিই। সেগুলো এখনো এই টুপির তলে (টুপিটা নেড়ে নিলে) পুরে রেখেছি। হেঁ-হেঁ-হেঁ। মিস্ ফ্রিজ ছিলেন নারী দেহে হারকিউলিস্, বুঝলে বাছারা। ভুল বেভুল হলে দুটো আঙ্গুল দিয়ে পেটে অ্যাসা টিপুনি লাগাতেন যে চোখের মধ্যে ভুবনঘোরা দেখিয়ে ছাড়তেন। খাস বিলিতী বাচ্চা ছিলেন কিনা। তবে শেষ পর্যন্ত বদরাগটা বদরোগে দাঁড়িয়ে গেছল। বিয়েটা তো হলনা ওই জন্যেই। সব ঠিক-ঠাক। এন্‌গেজ্‌মেণ্ট অবধি হয়ে গেছে। বিয়ের তারিখটা নিয়ে একটু ঝামেলা বাধল। মিঃ গ্লোবেয়ার আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। তার ছিল মস্ত এক বাথান। গরু-মহিষ এন্তার। অমন ফার্ষ্টক্লাস চকোলেট তো আমি আর জন্মে খাইনি। হলে হবে কি। বুদ্ধিতে ছিলেন একটু খাটো! বিয়ের

তারিখের হিসেবে কি একটা গোলমাল করে ফেললেন। আর যাবে কোথায়? মিস্ ফ্রিজের ছুটো আঙুল তার পেটে ঢুকে অ্যাসা টিপুনি লাগাল যে একেবারে রংছুট্ দেখে ছাড়লেন মিঃ গ্লোবেয়ার। তার পর সেই তক্ষুণি 'গন উইথ দি উইণ্ড্' দে হাওয়া। আরে অ্যাই অ্যাই ড্যাম সোয়াইন······

টমি খুড়ো ছুটলেন একটা সহিসের দিকে। আমরা ওর কথার তোড়ে পাথর-বসা বসে গেছলুম। এবারে নড়েচড়ে বসলুম। ভৌমিক বললে, ওঃ কি যন্তর একখানা মাইরি! না টানতেই মালকোষে আলাপ! একেবারে ফুল-তুবড়ি ছুটিয়ে ছাড়লে। চল কেটে পড়ি। নইলে আবার কার ঠিকুজি শুনিয়ে ছাড়বে।

পেছু ফিরতেই চমকে উঠলুম। মেহেদি রং ছোপ দেড়েল হাবিলদার একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমি তো দস্তুরমত ভড়কে গেলুম। ভৌমিকের আর ফজলের মনোভাবের খবর আলাতালার রাখবার কথা। সুতরাং বুঝলুম না। ডলবি তো আমারও বাড়া। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। হাবিলদার জিজ্ঞাসা করলে, ও সাহেব কৌন হ্যায়? কেউ কিছু বলবার আগেই ভৌমিক ডাঁট্সে বলে ফেললে, হামলোগকা দোস্ত হ্যায়। তারপর ডলবিকে দেখিয়ে বললে, এর চাচা হয়। আমাদের দোস্ত! দোস্তের চাচা! হাবিলদারের চোখ ছুটো হাইজাম্প দিতে গিয়েও থেমে গেল। হাবিলদারজী ভক্তি গদগদ হয়ে বললে, কি জিজ্ঞেস করছিলেন সাহেব? ভৌমিক ট্যারাচোখে

হাবিলদারের মুখভাব লক্ষ্য করে গম্ভীরসে বললে, সকাল বেলাকার প্যারেড দেখে খুব চটে গেছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করছিল, কে প্যারেড করাচ্ছিল ?

হাবিলদারের মেহেদিরঙ্গা দাড়ি যেন ফ্যাকাশে মেরে গেল। ঢোঁক চিপতে চিপতে বললে, নাম জানতে চাইলেন ? কেন, কেন ? ভৌমিক আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তা আমি কি জানি। সাহেব বললে, আমি কর্ণেল ছিলুম। আধঘণ্টা ধরে তোমাদের প্যারেড দেখেছি। কোন্ বুদ্ধু বেয়াকুব তোমাদের প্যারেড করাচ্ছিল, নামটা বল তো। হাবিলদার প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, জরুর কোই গলত্ হো গিয়া হোগা। নিশ্চয়ই কোন গলতি হয়ে গেছে। এখন কি হবে ? ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, দোহাই দাদা, কর্ণেল সাহেবকে আমার নামটা বলো না। বুড়ো মানুষ চাকরি গেলে না খেয়ে মারা পড়ব।

ভৌমিক অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে। ওর ভাব সাব দেখে মনে হল সওয়াল জবাব সব হয়ে গেছে, এখন জুরীদের ফোরম্যান এসে 'গিল্টি নট্ গিল্টি' বলবার ওয়াস্তা, তাহলেই ও রায়টা দিয়ে দিতে পারে। একটু পরে রায় দিলে, আচ্ছা বলছে যখন বন্ধুলোক, তখন নামটা না হয় নাই বললুম, কি বলিস্। হ্যাঁ, আমিও মাতব্বরের মত বললুম, এবারের মত ছেড়েই দে। বুড়ো মানুষ ভুলচুক একটু করে ফেলেছে। কি আর হবে।

ভৌমিক বললে, যাও হাবিলদার সাহেব, সাহেবকে আমি বুঝিয়ে বলে দেব'খন। হাবিলদারজী খুশী হলেন। জিতা রহো, বলে চলে গেলেন। ভৌমিক বললে, ব্যাটাকে হাতে পাওয়া গেছে। এবার কার হালুয়া কে খারাপ করে দেখা যাবে।

পরস্পর নাক ঘষাঘষি করা ছাড়া দ্বিতীয় কাজ আর আমাদের কিছু ছিল না। সকালে প্যারেড আর নামটা হাজরে দেওয়া। আফিসই ভাল করে বসেনি। সারাদিন শুয়ে থাকি, গুলতানি করি, এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াই। টমি খুড়োর সঙ্গে আড্ডা জামাই। কি মতলব সরকারের কে জানে! এদিকে লোক ভর্তির কামাই নেই। রোজই নতুন নতুন লোক আমদানি হচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টীয়ান, বাঙ্গালী, বিহারী, ফিরিঙ্গী, পাঞ্জাবী, নেপালী, উড়িয়া। সর্বজাতের লোক, সব ধর্মের লোক। কি হবে এত লোক? কি আমাদের কাজ? কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। যার কাছে শুধোই সেই জবাব দেয়, কি জানি? দেখা যাক না কি হয় শেষ পর্যন্ত। ফজলে করিমের দৌলতে চাঁটগেঁয়ে চাচার হোটেলে তো দিব্যি ধারে খেয়ে চলেছি। ভৌমিকের ট্যাঁক চাঁছা-পোঁছা। আমারও তথৈবচ। ডলবির কি আছে না আছে কে জানে? মাস শেষ হলে তবে মাইনে। মাইনে আদপেই পাওয়া যাবে কি না তার ঠিক কি? গতিক লক্ষণ সুবিধে ঠেকছে না।

কিন্তু এ সবে কি আসে যায়। টমি খুড়ো একদিন বললে, কুছপরোয়া নেই বাছারা, আজকের চায়ের দাম মিটিয়ে ক'পয়সা

থাকবে ছ্যাখ তো। বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। জজকোর্টের গাছতলায় চা দোকানে বসে গুলতানি হচ্ছিল। চায়ের কাপ শেষ করে টমি খুড়ো পরামর্শ দিতে লাগল। দেখি সব বার কর। ট্যাঁক খুললুম সবাই। আমাদের সকলের তবিল মিলিয়ে হল ছুটাকা সাত আনা। টমি খুড়ো বললে, ঠিক হ্যায়। আমি আর ছুটাকা ন আনা দিচ্ছি। পাঁচ টাকাই আজ উইনে ধরব। ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের আজ দৌড়ুবার কথা। মুখটা আমাদের কাছে নামিয়ে বললে, বলিস্ না কাউকে হ্যারি নিজে টিপস্ দিয়েছে। আর ব্ল্যাকি আমার হাতের তৈরী ঘোড়া। ও কক্ষনো তাক ফসকায়নি। আমি বুকে করে ওকে মানুষ করেছি। আমার সঙ্গে কখনো বেইমানি করবে না তোবা দেখিস্। ওতো ঘোড়া নয়, আমার বড় ছেলে। ক্রাউন প্রিন্স। হা-হা-হা।

ডলবি বললে, সবটা উইনে ধরবাব দরকার কি? কিছু প্লেসেও ধরা যাক। ওই তো আমাদের পুঁজি। তাক ফসকালে কাল থেকে নির্ভেজাল বুড়ো আঙ্গুল চুষতে হবে। কিন্তু খুড়োকে তার খোঁট থেকে কে নড়াবে? বাছারা, এই কাজে চুল পাকালুম। আমার কথা মেনেই ছ্যাখ। আজ ব্ল্যাকিরই দিন।

তিনটে বাজতে না বাজতেই ছুটলুম রেসকোর্সে। ফজলে করিম আসেনি মাঠে। ভেতরে ঢোকার পয়সা নেই। খুড়ো বললে, দাঁড়া এখানে। ধীরে ধীরে চারদিকের উত্তেজনা আমাদের শরীরেও ভর করতে লাগল। ডলবির মুখে আজ খৈ ফুটছে।

ভৌমিক ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকছে। আমার বুকে ধাপড় ধোপড় ঢেঁকি আছাড়ের বেল উঠছে। মনে মনে ভাবছি, যদি লাখ টাকা পেয়ে যাই, রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ডবল মামলেট একটা খাবই।

রেস শুরু হল। কি উত্তেজনা! তাবৎ লোক ঘোড়ার পায়ে পায়ে ছুটে চলছে। কিন্তু স্থূল দেহটা আটকে আছে নিজের গতিহীন পায়ে ভর দিয়ে। এই যে ছুটতে গিয়ে হ্যাঁচকা টান, এটার জন্য একটা অস্বস্তি সর্বশরীরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। গতির আবেগটা কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়ে সেই অস্বস্তিটার একটু উপশম হচ্ছে। তাই রেসের মাঠে এত চিল্লা-চিল্লি। কিন্তু টমি খুড়োর পাত্তা নেই। কি হল ভাবছি। হঠাৎ চীৎকার উঠল বাক আপ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। সর্বশরীর দুলে উঠল আমার। যেন রেসের মাঠ বনে গেল। সেই মাঠে আর ঘোড়া নেই। শুধু তীরের মতো কেশর উড়িয়ে একটা ঘোড়াই ছুটে চলেছে। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। বাক আপ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড বাক আপ। বাক আপ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড বাক আপ।

খেয়াল ছিল না কখন থেকে প্রাণপণে চীৎকার করে চলেছি। খেয়াল ছিল না কতক্ষণ ধরে চীৎকার করছি। প্রচণ্ড ঝাঁকানি খেয়ে যখন চাইলুম তখন দেখি ভৌমিক ঝাঁকানি দিচ্ছে। চারদিকে একটা বিশৃঙ্খল ভিড়। গোলমাল উত্তেজনা চাকভাঙ্গা মৌমাছির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। অ্যাই অ্যাই, কি

করছিস্। ভৌমিক আমাকে খুবসে ঝাঁকাচ্ছে। ওকে দেখেই বলে উঠলুম, কি রে জিত তো? ব্ল্যাক ডায়মণ্ড জিতেছে? ভৌমিক বললে, না না। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড মারা পড়েছে বোধ হয়। টমি খুড়োর পাত্তা নেই। ডলবি খোঁজ নিতে গেছে। এই তো ডলবি। কি রে? কি ব্যাপার?

ওঃ গড্! হরিবল! ডলবির মুখ ফ্যাকাশে। চোখ টলোটলো। কি রে কি হয়েছে? আমি আর ভৌমিক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করি। ডলবি একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, ব্ল্যাক ডায়মণ্ড হার্ডেলে পা লেগে পড়ে যায়। সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। টমি খুড়ো কোত্থেকে পাগলের মত ছুটে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের বুকের উপর আছড়ে পড়ে। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যন্ত্রণায় প্রবলভাবে পা ছুঁড়ছিল। একটা চাঁট খুড়োর বুকে লেগে যায়। হাড় পাঁজরা চুরমার হয়ে গেছে বুড়োর। ওঃ গড্! কোথায় খুড়ো, কোথায়? শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। চল চল। ছোট ছোট।

তিনজনে রাত আটটার সময় হাসপাতালে পৌঁছলুম। এমার্জেন্সি ওয়ার্ড খুঁজে ডলবি জিজ্ঞাসা করলে, টমসন ম্যাকডুগল? একজন ডাক্তার সেইমাত্র একটা কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। টমসন ম্যাকডুগল? আপনি তার আত্মীয়? ভেরি সরি। ডেড্। ডলবি সঙ্গে সঙ্গে টুপি খুলে ফেললে। ডেড্। মৃত। কথাটা আয়োডোফর্মের মর্বিড গন্ধ, ডাক্তার

নার্সের শ্বেতশুভ্র অ্যাপ্রন আর হাসপাতালের চাপা স্তব্ধতার সঙ্গে কত মানানসই।

ডাক্তার আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন, দেখে আসতে পারেন।

বহুদিন নবদ্বীপে কাটিয়েছি। গঙ্গার ধারে শহর। ছোটবেলায় দেখতুম বর্ষা এলে মাঠ ময়দান ভাসিয়ে মা গঙ্গা বাঁধাঘাটে এসে মাথা ঠুকতেন। বর্ষা শেষ হলে করতেন স্বস্থানে প্রস্থান। শুধু রেখে যেতেন গাদাখানেক ব্যাদবেদে পলিকাদা। সেই কাদা শুকিয়ে গেলে ঝাউগাছের বন মাথা চাড়া দিয়ে আসর জমাতো। যতদূর চাও ঝাউ আর ঝাউ। মনে হতো এ বুঝি চিরতরে খুঁটি গেড়ে বসলো। কিন্তু পরের বছর যেই বর্ষা আসা আবার যে কে সেই। সেই জল থৈ থৈ। কোথায় ঝাউগাছ আর কোন্‌খানে তার অরণ্য? দুঃখ শোকের ব্যাপারটাও এই ঝাউবনের মতো। প্রথম চোট মনে হয় খুঁটি গেড়ে বসলো বোধহয় চিরজন্মের মতো। কিন্তু পরে দেখা যায় মানুষের সদা বয়ে-যাওয়া প্রাণের বন্যায় তা কখন কোথায় যেন ভেসে গেছে। টমি খুড়োর শোকের ধাক্কা কাটাতে খুব বেশী সময় লাগলো না। একদিন খিদিরপুরের এক ন্যাড়াগীর্জেয় চারজনে মিলে খুড়োর নামে চারটে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে এলুম। ফিরে আসবো এমন সময় দেখি ডলবি পকেট থেকে আর একটা মোমবাতি বের করে হাঁটু গেড়ে বসে জ্বালাচ্ছে। বেরিয়ে এলে জিজ্ঞাসা করলুম, ওটা কার জন্যে?

বললে, ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের। ওদেরো তো আত্মা আছে। বলেই উপর দিকে চাইলে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ঘোড়াটা খুড়োর খুব প্যায়ারের ছিল। এই বাতি দেখে দেখে ঠিক খুড়োর কাছে পৌঁছে যাবে দেখিস্। উপর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, ওখানে খুব অন্ধকার কি না?

আর্নেস্ট গ্যাঞ্জেসকে আমরা গঙ্গাসাহেব বলতুম। জাতে মেটে ফিরিঙ্গী। বেঁটে-খাটো, রোগা একহারা চেহারা কিন্তু তার ভেতরই একটা শক্তিসামর্থ্যের তাগড়া চেকনাই। বয়েস পঞ্চাশের উপর হয়ে গেছে। সামনের ছুটো দাঁত পড়ে গেছে তবু শরীরে তাকতের পুরো জোয়ার। পেয়াদা যেন জরার পরোয়ানা এনে বৈঠকখানায় বসে গুড়ুক টানছে, হুকুম পায়নি বলে অন্দরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। এক দিদি ছাড়া তিনকুলে আপন বলতে কেউ নেই। আর পুলিশের ছাড়া তিনি করেননি ছুনিয়ায় এমন কোন কাজ নেই।

গঙ্গাসাহেবের সঙ্গে আলাপের স্থচনাটি বড় মজার। তখন খাচ্ছিদাচ্ছি আর হুক্কা টেনে বেড়াচ্ছি। একদিন ভৌমিক এসে বললে, এক বেটা মেটে বজ্জাত এল মাইরি, স্থখের দিন খোলে পুরে ফ্যালো ব্রাদার। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার? না, এক স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলেন আমাদের ওপর। লাল সিং দাড়ি দিয়ে তার জুতো পালিশ করে দিতে গিয়ে ধমক খেয়েছে। সরকার সাহেব (আমাদের ডিপো ইনচার্জ) এর মধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন। ছুজন কেরানীকে অন্যত্তর বদলি করে দিয়েছে। আসতে না আসতেই এই। আরো তো বহু দিন রাত্তির

আমাদের সামনে পড়ে আছে। ভৌমিক বললে, জান কয়লা করে দেবে মাইরি। তবে ঘাবড়াস্‌নে, বেশী তেড়িবেড়ি করলে অ্যাসা প্যাণ্ডাই দোবো যে বেটাচ্ছেলেকে গোকুলে গিয়ে গুলি খেলতে হবে।

তবু আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। পরদিন কুচকাওয়াজের ময়দানে লোকটিকে দেখলুম। বললেন, শুন, ঠিকমত কাজ করলেই আমি খুশী থাকব। আশা করি মনে রাখবে। ডিসিপ্লিনের খেলাপ কিছু বরদাস্ত করব না, বুঝলে ?

মাথা নেড়ে চলে এলুম। কিন্তু ধরা পড়লুম ছদিন বাদেই। সেদিন রোববার, ডিউটি ছিল। তবু গিয়েছিলুম সকালের শোতে সিনেমা দেখতে। অমন প্রতি রোববারই যেতুম। ফিরতেই মুফিজুল বললে, মরেছিস্। গঙ্গাসাহেব তোদের নম্বর নিয়ে গেছে। আমার দফা তো ওখানেই ঠাণ্ডা মেরে গেল। সারাদিন ভয়ে ভয়ে কাটালুম, কিন্তু কিছু আর ঘটল না। পরদিন কুচকাওয়াজের সময় গঙ্গাসাহেবকে দেখলুম। বুকটা ছচারবার ধপাস ধপাস করল। গঙ্গাসাহেব নাম ডাকলেন। আমার, ভৌমিকের, ডলবির। আলাদা সারে দাঁড়ালুম। আমাদেরকে আফিসে যেতে বলা হল, গেলুম। গঙ্গাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কাল কোথায় গিয়েছিলে ? ডলবি বললে, চার্চে স্যর। ডিউটি ফেলে ? ভৌমিক অমনি জবাব দিলে, ডিউটি স্যর বদলে দিতে বলেছিলুম। এবার গঙ্গাসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা

করলেন, তুমি? জবাব দিলুম, আমিও চার্চে গিয়েছিলুম স্যর। তুমি কি ক্রীশ্চান? অম্লান বদনে বললুম, হ্যাঁ স্যর। তখন আর ভাববার সময় ছিল না। ভৌমিক একদিন বলেছিল, গ্যাখ্ যে মিথ্যে জিভের ডগে আপ্সে আসে, সেই হল আসল সত্যি। আমিও তাই জিভের গেরো আলগা করে দিয়েছিলুম। গঙ্গাসাহেবও মনে হল, আমার ঠাণ্ডাগলার ত্বরিৎ মিথ্যে শুনে ঘাবড়ে গেছেন। একটু থ মেরে বসে রইলেন। তারপর উঠেই ড্রয়ার টেনে একখানা খাতা বার করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, নাম? বললুম। বাবার নাম? বললুম। বয়েস? বললুম। ধর্ম? বললুম, আমি ক্রীশ্চান। এবার গঙ্গাসাহেব বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর ডাকলেন, এদিকে এস। এগিয়ে গেলুম। পাতার এক জায়গায় আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? সর্বনাশ! এটা তো আগে মনে হয়নি। দেখলুম ধর্মের কোঠায় বড় করে দাগা আছে 'হ'—হিন্দু। মাথাটা বোঁ করে চক্কর দিতে যাচ্ছিল, থামিয়ে বললুম, ঠিকই আছে স্যর। সাহেবই এবার ঘাবড়ে গেলেন। কি ব্যাপার? ভয় না পেয়ে, ভড়কে না গিয়ে শান্তস্বরে স্পষ্ট করে বললুম, আমরা ইণ্ডিয়ানরা, নিজেদের দেশকে আর ইণ্ডিয়া বলছিনে, বলতে শুরু করেছি হিন্দুস্তান। লড়াই বাদ স্বাধীনতা এলে আমাদের দেশের এই নামটাই চালু হবে। আর হিন্দুস্তানের তামাম লোকই তো হিন্দু। তা সে মুসলমান

খ্রীষ্টানই হোক আর মেয়েমানুষই হোক। কাজেই ওটা ঠিকই আছে স্যর, আমি হিন্দু খ্রীষ্টান।

জবাব শুনে গঙ্গাসাহেবের মুখে মাছি ঢুকে গেল বোধ হয়। একটু পরেই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, জবাবে ফাঁক আছে, তবু আমার পছন্দ হয়েছে, বহুত আচ্ছা। হিন্দু ক্রীশ্চান, অ্যাঁ। বাঃ বেশ জবাব দিয়েছ। যাও ডিস্‌মিস্‌। সালাম ঠুকে দৌড় দিলুম। সেই থেকে আমরা গঙ্গাসাহেবের নেক-নজরে পড়ে গেলুম। সকলে আমাদের কজনকে তাই গঙ্গাপুত্তুর বলে ডাকত।

গঙ্গাসাহেব এসে শেষ পর্যন্ত মোড় ঘোরালেন। সুরাহা করলেন আমাদের বে-বন্দোবস্তির। নিয়মকানুন ছিল না, নিয়ম কানুন হল। থাকবার জায়গা ছিল না, থাকবার জায়গা হল। সর্বোপরি আমাদের তালিম ট্রেণিং শুরু হল। বুঝলুম আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য। হদিস পেলুম ভবিষ্যতের।

হাওয়াই হামলা হলে যখন টুট ফুট হয়ে যাবে শহরে, বোমার ঘায়ে চিড় ধরবে বাড়ীতে, ফাট ধরবে রাস্তায়, তখন শুরু হবে রেসকিউ সার্ভিসের কাজ, ত্রাণ দলের তোড়জোড়। ইট, কংক্রীটের স্তূপ সরাও, বরগা কড়ির অবরোধ ভাঙো, ইলেকট্রিকের তার সামালো। দেখো, কোথায় চাপা পড়ে আছে এক শিশু, দেখো আগুনে বোমায় তাড়া করেছে কোন পঙ্গুকে। ধোঁয়া ভর্তি ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে সন্ধান করো আর্ত আহতের,

বের করে আনো। দাঁড়িয়ে আছে এম্বুলেন্স, শ্বেতশুভ্রবসনা স্মিতবদনা সেবিকা দল, তাদের হাতে জিম্মা করে দাও। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ত্রাণ করে জীবনের উদয়পথে পৌঁছে দাও বলেই তো তোমরা ত্রাণকারী, রেসকিউআর। তোমাদের কাছে সব চেয়ে মূল্যবান জীবন। তার মধ্যে তোমার জীবনও আছে মনে রেখো। কাজেই সব কিছু ছেড়ে তোমার প্রথম চেষ্টা জীবনের উদ্ধার। বুদ্ধিকে স্থির রাখো। চাঞ্চল্য আনো দেহে। তড়িৎগতি কাজ করা চাই। তোমরা সব বাহাদুর। তোমাদের কাজ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। তোমাদের কর্তব্য মহান।

গঙ্গাসাহেব যাদুকর। কদিনেই আমাদের ভোল ফিরিয়ে দিলে। শিখলুম কায়দা কসরত। দেওয়াল টপকে যাওয়া। চারতলা তিনতলা উঁচু থেকে দড়ি করে লোক নামানো, দড়ি ধরে নামা। অসংখ্য রকমের গেরো বাঁধা শিখলুম। তিন তিনটে শালের খুঁটিকে একত্র খাড়া করে মুহূর্তের মধ্যে তার সঙ্গে কপিকল ফিট করে তৈরি করতে শিখলুম ক্রেণ। আড়িয়া—টানো টানো, উঠাও উঠাও। হা—ফি—জ—ঢিল দাও, ঢিল দাও, নামাও নামাও। ব্যস্ততায় উত্তেজনায়, দিন রাত্রি আকারে ছোট হয়ে গেল।

পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উতরে যেতে লাগলুম। শাবাশ ডলবি, শাবাশ ভৌমিক, পাণিগ্রাহী, মুফিজুল, ফজলে করিম,

বলিহারী ইন্দর সিং, বচন সিং, সাধু সিং, লাকবিহারী থাপা। এরা সব পয়লা নম্বর। টপাক টপাক টপকে যায়। দলের সব লোকেরা চক্ চক্ চোখে তাকিয়ে এদের দেখে। আমার দম কম, কমজোরী, তুবলা আদমী। সব সময় এঁটে উঠতে পারিনে। সাধ যায় ওদের সারে দাঁড়াতে, সাধ্য নেই। দল ছাড়া হয়ে পড়ি। মাঝারীদের মধ্যে পাণ্ডা বনি।

এবার ফায়ার ফাইটিং। স্টিরাপ পাম্প দিয়ে আগুন নেবাতে যাওয়া। প্রথম দিন হেসেই গড়িয়ে পড়ে সব। গণ্ডুষ করে জল এনে দাবানল নেবাবে। যত বোগাস। কিন্তু গঙ্গাসাহেব তেমনি সিরিয়স্। বুঝিয়ে দিলে স্টিরাপের কাজ নয় বড় আগুন নেবানো। তার জন্যে তো ফায়ার ব্রিগেড আছে। কিন্তু একেবারে হেলাছেদ্দা করবার চীজও নয় এই স্টিরাপ পাম্প। তিনটে বালতি আর এই পাম্প ঠিক সময়ে তাক মতো কাজ করলে চারটে ফায়ার ব্রিগেডের ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে দিতে পারে। আমার ঘুম ছুটে গেল, রাতদিন স্টিরাপ পাম্পের পিছনে লেগে রইলুম। চেষ্টা করে অদল বদল করে ওর জল ছোঁড়বার ক্ষমতা খানিকটে বাড়িয়ে ফেললুম।

শুরু হল বোমা কাবু করা শিক্ষা। সব চেয়ে শত্রু হল ভয়। ভয়কে কাবু করতে পারলেই বোমাকে কাত করা সোজা হবে। বড় বড় বোমায় অবশ্য করণীয় কিছু নেই। শুধু

অসহায় ভাবে, এ. আর. পি. আশ্রয়ে গা বাঁচিয়ে দেখে যাও। কোথায় এসে পড়ল, কেমন করে ফাটল দেখবার উপায় নেই। দেখো শুধু ধ্বংস আর ক্ষয় আর ক্ষতি। অলক্লিয়ার হয়ে যাক, তারপর মাথায় লোহার টুপি এঁটে গ্যাস-মুখোস পিঠে ঝুলিয়ে খন্তাশাবলশালেরগুঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড় কাজে। তবে ছোট ছোট আগুনে বোমায় তোমাকে বেরুতে হবে বালির বস্তা আর স্টিরাপ পাম্পকে হাতিয়ার করে।

শিক্ষা শেষ হল। শেষে একটা পরীক্ষা হবে ঠিক হল। সত্যিকারের একটা মহড়া। শোনা গেল নিউথিয়েটার্স স্টুডিও একটা সেট বানাচ্ছে, সেইটের উপরেই চলবে অগ্নিকাণ্ডের মহড়া। আমাদের সেণ্টারে উদ্যম আর উৎসাহ পাগলা হাওয়ার মতো সকলের প্রাণে প্রাণে ভর করল।

লোক বাছ করা হচ্ছে। বাছাই করা লোক দিয়েই হবে রিহার্সেলটা। সাড়ে পাঁচ শ লোকের মধ্যে মাত্র পনরো জনকে দেওয়া হবে এই সম্মান। সরকার থেকে ব্যাজ তৈরী করা হয়েছে, সেই ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হবে এই সব পয়লা নম্বুরেদের গলায়। এ. আর. পি.র বড়কর্তা এসেছেন, মেজো কর্তা এসেছেন, এসেছেন পুলিশ কমিশনার।

কাঠ পুতুলের মতো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, আমাদের মনের খাতায় হাজরে দিয়েছে চীনা সমুদ্রের অশান্ত আবহাওয়া। লালসিং হাঁক

দিলে—'টেনশন'। ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ড। আড় চোখে চেয়ে দেখলুম ফজলে করিমকে। ওর আধা পেশোয়ারী মুখের পেশী নট্ নড়ন চড়ন। দেখে বোঝবার উপায় নেই কি ভাবছে। গঙ্গাসাহেব এসে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমাদের মধ্যে পনরো জনকে মাত্র এই সম্মান দেওয়া হবে। যে পনরো জনের নাম ডাকা হচ্ছে তারা পাঁচ কদম এগিয়ে এস লাইন থেকে। নাও, এখন নাম ডাকা হচ্ছে। ক্রিস্টোফার ডোমনিক (সাহেব ভৌমিককে ডোমনিক বলতো), এলবার্ট এড্ওয়ার্ড ডলবি, পানিগাছি (পানিগ্রাহীকে), লাকবিহারী থাপা, ফজলে করিম খান, ইন্দর সিং। নাম ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা এক এক করে এগিয়ে চলেছে। এক জন এক জন যাচ্ছে আর মনের ঘণ্টায় একটা একটা করে বাড়ি পড়ছে। মন বলছে এবার কে ? এবার কে ? বর্চন সিং, সাধু সিং। আটজন, নয়জন, দশজন, এগারোজন। এক জন এক জন করে পাঁচ পা এগিয়ে যাচ্ছে আর জোড়া জোড়া চোখ ওদের উপর পড়ছে। বারোজন। এবার কে ? এবার কে ? মোহাম্মদ হুসেন, তেরো। এবার ? আমি ? আমি! আমার নাম ডেকেছে। থরথর করে কেঁপে উঠলুম। কিন্তু ততক্ষণে আপনা থেকেই পাঁচ পা এগিয়ে সার দিয়েছি।

একটা আলাদা সার দিলুম আমরা, ব্যাজ পরলুম, স্যালুট দিলুম, শেষ হল সেদিনের কাজ। হঠাৎ দেখি গঙ্গাসাহেব এক একজনকে জড়িয়ে ধরছেন আর বলছেন, বহুত আচ্ছা।

নিউথিয়েটার্স স্টুডিওতে নাকি এক বিরাট সেট বানানো হয়েছে। ফায়ারফাইটিং আর ত্রাণদলের একটা হাতেকলমে পরীক্ষা হবে। চাইকি ফিলিমও তোলা হতে পারে। আমাদের মধ্যে খুবই উত্তেজনা। টুপি, ব্যাগ, বোতাম, পোশাক, এমন কি চেহারা পর্যন্ত দলাই মলাই করে সাফসোফ রাখা হচ্ছে। দিনরাত্তির লোক নামানো উঠানো, নানাবিধ জিনিসে গাড়ীখানা ভর্তি রাখা, দৌড়ে দৌড়ে চলন্ত মোটরে ওঠা, লাফিয়ে লাফিয়ে পাঁচিল টপকানো—পাঁচরকম কাজের মহড়া চলছে। আমাদের হাড়গোড় সব শক্ত একেবারে ইস্টিল হয়ে দাঁড়াল।

তখন সিঙ্গাপুরে বোমা পড়ছে। রেঙ্গুন ছাতু ছাতু। বর্মায় জাপানীরা ঢুকে পড়েছে। ওসব অঞ্চলে দারুণ লড়াই হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। লড়াই সম্বন্ধে ব্যারাকে বসে নানারকম আলাপ আলোচনা হয়, শুনি। একদিন শুনলুম, এই এ. আর. পি. এ আর কিছু নয়, লড়াইএ ভর্তি করবার আড়কাঠি। এখানে যারা ভর্তি হয়েছে কারো আর নিস্তার নেই। সবাইকেই যুদ্ধে যেতে হবে। গুজবটা এমনভাবে ছড়াল যে আমাদের ক্যাম্প থেকে একরাত্রেই প্রায় ত্রিশজন পালিয়ে চলে গেল। ওদের পালাতে দেখে সকলের মনেই ভয় ঢুকল। একরাত্রে ঘুমুচ্ছি, ঢং ঢং ঘণ্টা শুনে চমকে উঠে পড়লুম। স্বপ্ন দেখছিলুম জাপানীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে নরমুণ্ডের বোমা ফেলছে। আর তার মধ্যে আমি আমার মুণ্ডুটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে

বেড়াচ্ছি। এমন সময় ঘুমটা গেল ভেঙে। বাইরে গোলমাল, কান্নাকাটি। বেরিয়ে দেখি সেন্ট্রি প্রায় দশটা ছেলেকে ধরে রেখেছে। ব্যাপার কি ? না পালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সবাই মিলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম।

এমন সময় একদিন মাঝরাত্তিরে আমাদের সবাইকে সার দিতে হল। চারদিক নিষুতি। উপরে চেয়ে দেখলুম কুয়াশার পুরু কম্বল ভেদ করেও তারার আলোর ছাঁট গায়ে এসে লাগছে। গঙ্গা সাহেব হুকুম দিলেন। মোটরে উঠলুম। গাড়ী ছুটল। আমরা হতভম্ব। দেড় বছরের এ. আর. পি. জীবনে এ অভিজ্ঞতা প্রথম। কোথায় যাচ্ছি জানিনে। কেন যাচ্ছি তাও জানিনে। কেউ কথা বলছিনে। সবটা মিলিয়ে কেমন যেন রোমাঞ্চ রোমাঞ্চ। কাঁচা ঘুম ভাঙায় চোখ করকর করছে। মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছে। বেশীক্ষণ নয়, তবু মনে হল যুগযুগান্ত পার করে দিলুম। খিদিরপুরের পুল পেরিয়ে রেস ময়দানকে ডান হাতি রেখে হেস্টিংস্ দিয়ে গাড়ি ছুটল আর থামল এসে আউটরাম ঘাটে। গঙ্গায় বাঁধা জাহাজগুলো আবছা অন্ধকারে অঙ্কের মাস্টারের মতো গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এসে সারবন্দী হলুম। আশে পাশে চেয়ে দেখলুম আমাদের মতো আরো আমদানি হয়েছে। মুফিজুল চাটগেঁয়ে ছোকরা। ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিলে। ফিসফিস করে কাকে যেন বললে, জাহাজে করে চালান দেবে। মুখে মুখে

কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। চঞ্চল হয়ে উঠল সমস্ত দলটা। তারপর আচমকা যে যেদিকে পারে দিল ছুট। আমরা কজন ছাড়া আর সব ফাঁকা হয়ে গেল। গঙ্গা সাহেব নিজেও হতভম্ব হয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার! বললুম, ব্যাপার সঠিক আমরাও জানিনে। তবে ওরা ভয় পেয়ে গেছে। ভেবেছে জাহাজে করে যুদ্ধে পাঠানো হবে ওদের। গঙ্গা সাহেব বললেন, পাগল না কি? ছু' জাহাজ আহত এসেছে রেঙ্গুন থেকে। ওদের জাহাজ থেকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। ওই ছাখ এ্যাম্বুলেন্স। পিছন ফিরে দেখলুম সত্যিই খানকতক এ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে।

যুদ্ধের বীভৎসতার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল। না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল। ছুটো জাহাজ ভর্তি আহতের ভিড়। বৃদ্ধ যুবক শিশু পুরুষ নারী। কেউই রেহাই পায় নি। কারো হাত নেই, কারো পা নেই, মাথা ফাটা, চোখ খুবলানো। বিকলাঙ্গ মানুষের ভিড় এমনভাবে আর নিবিড় করে দেখিনি। অনভ্যস্ত স্নায়ু ঠিক থাকতে পারল না। পূঁজ রক্তের পচা গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক নার্স। আমার অবস্থা দেখে ইউক্যালিপটাস তেলমাখা একখানা রুমাল এগিয়ে দিলে। হেসে বললে, এ লাইনে নতুন বুঝি? লজ্জিতভাবে ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ। বললে, বুঝেছি, বাইরে যাও, একটু পরেই ধাতস্থ হয়ে যাবে'খন।

ভোরবেলা নাগাত জাহাজ খালাস করলুম। যারা এসেছে, বেশীর ভাগই বৃটিশ। শুনলুম রেঙ্গুনের একেবারে বারোটা বেজে গেছে। সেখানে যারা ছিল, হয় বোমার ঘায়ে মোগলাই খিচুড়ি বনেছে, নয় জাপানীদের বন্দী হয়েছে, আর না হয় পায়দলে হিন্দুস্তান মুখো রওনা দিয়েছে। কিসমতের খেল কিছু বলা যায় না। বরাতজোর থাকলে ওই টিকিটেই স্বর্গে যেতে কতক্ষণ ?

দিন সাতেক ধরে খাওয়া-বসা-শোয়ায় আমাদের শুধু এই আলোচনা। পলাতকদের মধ্যে আবার অনেকেই ফিরে এল। নিজেদের মধ্যেকার থমথমে ভাবের পুরু ধোঁয়ার আস্তরণ জীবনের বাতাস লেগে কিছু পাতলা হয়ে এসেছে। আগুনে বোমা কায়দা করবার স্টেজ রিহার্সাল হবে, তারই মহলা দিচ্ছি চৌপর দিন। রেডি—মোটরে ওঠো—মোটর থেকে নামো—সার দিয়ে দাঁড়াও—ডানদিক থেকে গুনতে থাক—এক···দুই···তিন···। জিনিসপত্তর নামাও। মই, শালের খুঁটি, বড় কপি, ছোট কপি, বড় দড়ির বাণ্ডিল, ম্যানিলা ল্যাসিংলাইন, জ্যাক, বড় কুড়ুল, ছোট কুড়ুল, বালতি, স্টিরাপ পাম্প, ঝুড়ি, কোদাল, রবারের দস্তানা, ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জাম, তারকাটা কাঁচি, গ্যাসমুখোস, ফার্স্টএড্ বাক্স, আরো কত কি ?

এগুলো গাড়িতে ওঠাতে আর গাড়ি থেকে নামাতে হাড়-পাঁজরা মফস্বলের বাসের অবস্থা হল। তবু উৎসাহ বজায় ছিল

নিউথিয়েটার্স স্টুডিওতে গিয়ে রিহার্সেল দেবো বলে। দেখতে দেখতে দিন চলে এল। আর একদিন মোটে বাকি। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলুম। সাতদিনের মধ্যে দুবার চুল ছেঁটেছি, তবু সেদিন বিকেলে আবার ছাঁটলুম। কিছুই বলা যায় না, একটা ফিলিমও উঠতে পারে। চাইকি কাননবালা, চন্দ্রাবতী, যমুনার মুখোমুখি পড়ে যেতে পারি। এতদিন পরে আমরা সত্যি সত্যি রেগে উঠলুম আমাদের পোশাকের উপরে। বিচ্ছিরি ছেয়ে রঙের বয়লারস্যুট। যতই স্টিমলণ্ড্রীতে কাঁচতে দিই কড়া ভাঁজ আর কিছুতেই পড়ে না, জলভেজা পুরোনো আমসত্ত্বের মতো ল্যাদব্যাদ ল্যাদব্যাদ করে। চুল ছেঁটে ছেঁটে পেছনে শাঁস বের করে ফেললুম। চেহারাটাকেও প্রায় হিরো হিরো বাগিয়ে এনেছিলুম। কিন্তু এই বয়লার-পোশাক শরীরে এঁটে আয়নায় এক নজর চেয়েই উৎসাহের আঁচে জল পড়ে গেল। একে স্বৃষ্টিকর্তাই মেরে রেখেছেন, বাকিটুকু দুরমুশ করলে এ. আর. পি.র দর্জি। এখন এই ওরাংওটাংচেহারা নিয়ে কাননবালাদের সামনে দাঁড়াব কি করে, সেই দুর্ভাবনা রাতের ঘুমকে ফুসলে নিয়ে হাওয়া দিলে।

পরদিন দস্তুরমতো চানটান করে পাউডার স্নো মেখে প্যারেড গ্রাউণ্ডে হাজির। এই জন্যে সেই হি হি শীতে আমাদের উঠতে হয়েছে ভোর চারটেয়। আগুন তো নেবাতে যাচ্ছিনে, চলেছি যেন কনে দেখতে। চারজনে মিলে তিনখানা নতুন সাবান

আর এক কৌটো স্নো শেষ করেছি। এসেন্সের খুশবু যখন বাতাসে সাঁতার কাটতে লাগল তখন আমাদের আশপাশের লোকদের তো দূরের কথা, বুড়ো আলীপুর জজকোর্টটা অবধি চোখচান্‌খে চেয়ে রইল। সেদিন আর প্যারেড হল না। আমরা গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। এখান থেকে ছুটো দল যাবে, ছুটো আসবে কাশীপুর থেকে আর পার্কসার্কাস এরিয়ার ছুটো। আমাদের দলের নেতা ভৌমিক। আরেকটার হাবিলদার লাল সিং খোদ। গঙ্গাসাহেব বললেন, দেখো মুখটা যেন থাকে। বলেই সকলের সঙ্গে হাতঝাঁকানি করলেন।

একখানা ছোট গাড়ীতে গঙ্গাসাহেব পথ দেখিয়ে চলেছেন। তারপর আমরা ছু দল ছু গাড়িতে। লেকের কাছে আসতেই দেখি পুলিস কমিশনারের গাড়ী। গঙ্গাসাহেব নেমে কমিশনারের সঙ্গে কি কথাবার্তা বলে আমাদের এসে জানালেন, স্টুডিও পাওয়া গেল না। কাজেই আগুনে বোমা আর জ্বালানো যাবে না। তবে বেরিয়ে যখন পড়েছ, কিছু কাজ করে যাও। এক পরিষদ সদস্য তার খালি বাড়িটা দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন। সেইখানেই চল, একটা মক্ ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে চলে যাই। মনে পুলকের যে চারা গাছটাকে এতদিন ধরে সার জল দিয়ে লালন পালন করে আসছিলুম, আজ এক ঝটকায় তার মাথা মোড়া হয়ে গেল। ভাঙা মন নিয়ে ছুটলুম পরিষদ সদস্যের বাড়ি।

পেল্লায় বাড়ি, বিরাট পাঁচিল, মস্ত গেট। গেটে এক বোম্বাই

তালা লাগানো। সেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিস কমিশনার হেসে বললেন, এই বাড়ীতে বোমা পড়েছে। ক'টা কথা মনে রেখো। জীবনের দাম সব চেয়ে বেশী। আর আগুন শিশু অবস্থাতেই জব্দ করা সোজা। যে জিনিসে আগুন লাগে তা থেকে সাবধান থাকলে ঝঞ্ঝাট অনেক কমে যায়। শক্তির সঙ্গে বুদ্ধি রাখলে কাজ হাসিল সোজা হয়। আর এমারজেন্সির কোন আইন নেই। রেডি। যাও।

আমরা ঝপাঝপ নেমে পড়লুম। গেটে তালা দেখে বাদবাকী সবাই ছুটল পাঁচিল টপকাতে। সবাই ধরাধরি করে মই নামিয়ে ফেললে অথচ আমাদের দল চুপ করে দাঁড়িয়ে। ভৌমিক কোন হুকুম দেয় না। জিজ্ঞাসা করতে যাব অমনি ভৌমিক ড্রাইভারকে হুকুম দিলে গেটের দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে। গেটের কাছে গিয়েই ইন্দর সিংকে বললে, কুড়োল দিয়ে তালা ভাঙ্গো। ইন্দর সিং এক কোপেই দিল তালার দফা গয়া করে। গাড়ি নিয়ে আমরা একেবারে ভেতরে। আর ওরা তখন পাঁচিলের আর্দ্ধেকটা উঠেছে।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলুম। সব ক'টি ঘরের দরজায় একটা করে তালা মুখ বুঁজে ঘাপটি মেরে খাড়া। সপাসপ কুড়ুলের কোপে তাদের দফা নিকেশ করে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়লুম। ডিম ভরা কৈ মাছের মতো ফার্ণিচার ঠাসা ঘর। খাট-পালঙ্ক-গদি-বিছানায় টাপুটুপু। এদের মাঝখানে প্রত্যেকটি

ঘরেই পড়ে আছে একটা করে হাত-পা বাঁধা কনেষ্টবল। বুকে একটা করে কাগজ আঁটা। কার হাত ভেঙেছে, কার বুকে চোট লেগেছে, কার মাথা ফেটেছে, তাই লেখা। সেই মতো এক একজনকে নিয়ে আসতে হবে অ্যাম্বুলেন্সে। চটপট কাজ সারলুম। প্রায় তিনভাগ লোককে আমরাই 'উদ্ধার' করলুম। মনের মধ্যে ফুর্তিটা নতুন জলের মাছের মতো খলবলিয়ে বেড়াচ্ছে। ফিরে আসব, ভৌমিক বললে, দাঁড়া, একটা কাজ বাকী আছে। বলেই একটা ঘরে ঢুকে গদি ছিঁড়তে শুরু করল। হুকুম দিলে, স্টিরাপ পাম্প, জলদি। চটপট স্টিরাপ পাম্প আনা হল, বালতি বালতি জল এল। ঘরের তাবৎ বিছানা গদিতে খোদ ব্রহ্মপুত্রকে নামিয়ে এনে আমরা কেটে পড়লুম।

ক্যাম্পে ফিরতেই আমাদের জয়জয়কার। গঙ্গাসাহেব তো খুশীতে ফুটিফাটা! ওঁর মুখ উজ্জ্বল করে এসেছি। গোটা ক্যাম্পের সুনাম রেখেছি। আমাদের আর পায় কে? সারাদিন গুলতানি করলুম। সন্ধ্যেবেলাতেও ফুর্তিফার্তি খুব জমেছে, এমন সময় গঙ্গাসাহেবের ডাক এল। খুশী মনে গঙ্গাসাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। দেখি পুলিস কমিশনার আর গঙ্গাসাহেব মুখখানা লাল করে বসে। গঙ্গাসাহেবকে এমন গম্ভীর আগে আর কখনো দেখিনি। বেজায় ভয় পেয়ে গেলুম। থমথমোমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ সকালে ডিমনস্ট্রেশানে গিয়ে সে বাড়ির গদি বিছানা সব কারা বরবাদ করে এসেছে। কমিশনার

সাহেব বলছেন, তোমাদের কাজ। ভৌমিক তুমি কি বল? ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ব ছাড়ব করতে লাগল। ভৌমিক একটুক্ষণ চুপ করে সবার মুখের দিকে চাইল, তারপর বললে, হ্যাঁ স্যর, ঠিকই বলেছেন উনি। এ আমাদেরই কাজ। সর্বনাশ, ভৌমিক একি করল! এত গম্ভীরভাবে কথা ক'টি বললে যে, গঙ্গাসাহেব এমন কি পুলিস কমিশনার অবধি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কেন করলে এ কাজ? ভৌমিক তেমনি গম্ভীরভাবে বললে, স্যর কমিশনার সাহেবের হুকুমে। হোয়াট্! কী! ভাব দেখে মনে হল কমিশনার সাহেবের নিজের গা গতরকেও বিশ্বাস করতে বাধো বাধো ঠেকছে! আমি! আমি হুকুম দিয়েছি! ভৌমিক সমান তালে জবাব দিয়ে চলল, আমার স্মৃতিশক্তি তাই বলছে স্যর। আপনি বলেছিলেন স্যর, যে সব জিনিসে আগুন লাগে সেগুলোকে কায়দা করলে এক শ ঝঞ্ঝাট এসে এসে দাঁড়াবে। আরো বলেছিলেন স্যর, এমার্জেন্সি কোনো আইন মানে না, তাই স্যর আমরা একটু সাবধানতা অবলম্বন করেছিলুম। কে না জানে স্যর, যে বিছানা গদি দাহ্য পদার্থ। আমাদের 'কোডে'ও আছে স্যর, জীবন ছাড়া—ভৌমিক কথা শেষ করতে পারল না। কমিশনার সাহেব টেবিল চাপড়িয়ে গর্জে উঠলেন, সাট আপ্, চোপরও। নিকাল যাও, বদমাশের ধাড়ী। মরা প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে এলুম। দেখি ভৌমিক ফিক ফিক করে হাসছে।

বললে, গজরানিটা দেখলি। ভয়ে ভয়ে বললুম, কিন্তু কাজটা ভাল করিসনি। ফ্যাসাদে ফেলবে বলে মনে হচ্ছে। ভৌমিক দুই বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বললে, করবে আমার লবডঙ্কা।

সত্যি, শেষ পর্যন্ত কিছুই আর হল না।

যত রকম ডিউটি ছিল আমাদের, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগত সেন্ট্রি ডিউটিটা। পালা করে আমাদের পাহারা দেবার ডিউটি পড়ত। আমরা হুজন হুজন করে পালা করতুম। হু'ঘণ্টা করে ডিউটি, ছ'ঘণ্টা ছুটি। সেদিনও আমাদের গ্রুপের সেন্ট্রি ডিউটি। তার মানেই সারাটা দিন ফাঁকি।

সেদিন আমি আর ভৌমিক পালা বাঁধলুম। বিকেল চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত ডিউটি দিলুম ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ছ'টার সময় ফজলে করিম আর ডলবির ঘাড়ে ডিউটির জোয়ালটি ছেড়ে দিয়ে ফটকের বাইরে বেরিয়ে এলুম।

আলীপুর রোড জজকোর্ট রোডটাকে সড়কিগাঁথা গেঁথে সিধে বেরিয়ে গেছে। শীতের হাতের খরখরে ছোঁয়া লেগে গাছগুলো থেকে বুড়ো পাতারা ঝুর ঝুর ঝুর ঝুর করে রাতদিন তার উপর ঝরে পড়ছে। মনটাও যেন ঝরবো ঝরবো করে ওঠে। (ক্ষয়ের আকর্ষণ এমনই !) ঢিলেঢালা ভাবনাগুলোকে মাথায় চাপিয়ে শিথিল পায়ে হাঁটছিলুম। হঠাৎ ভৌমিক শিস্ দিয়ে বলে উঠলে, চলেছে মাইরি ! হঠাৎ ওর এই উটকো পুলকের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলুম মিস্ গ্রিফিথ্‌কে। জোর পায়ে হাসপাতালে ঢুকছে।

মিস্ গ্রিফিথের উপর কেন জানিনে এ. আর. পি. সেণ্টারের এক শ আট জোড়া চোখ থির হয়ে থাকত। দূর থেকে জোর পায়ে হাঁটা কোন মেমকে আবছা দেখা গেলে অমনি সেই তল্লাটে রব উঠত। চোখ মটকে ভৌমিক বললে, ডাঃ চাটুজ্জের ডিউটি যদি এখন না হয় তো বাবা যীশুর কাঠ ফোঁড়াই মিথ্যে তা বলে দিলুম। হাসলুম। বলবার কিছু ছিল না।

আমাদের জন্য ছোট্ট একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। সেইটে আবার হল ফার্ষ্ট এড্ সেণ্টার। ওই তল্লাটের যাবতীয় মেমসাহেবরা নাম লেখালে ফার্ষ্ট এড্ সার্ভিসে। ডাঃ চাটুজ্জে হলেন ইনচার্জ। সেইসূত্রে মিস্ গ্রিফিথের আগমন। এবং তারপর স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তুটো নাম জড়িয়ে পড়ে আমাদের বেকার সময়গুলো মসলাদার হয়ে উঠল।

ভৌমিক বললে, চ' একটু রংবাজির খেল দেখে আসি। এ সব কর্মে আমার উৎসাহ ভাঁটাশূন্য। তুজনে হাসপাতালে ঢুকলুম। মুকুন্দ বেয়ারা টুলে বসে যথারীতি ঢুলছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, চাটারজী সাহেব আছেন? চোখ না খুলেই ও হাঁ বলে দিলে। ভিজিটিং রুমে ঢুকলুম। ওর পরেই ডাক্তার চাটুজ্জের খাস কামরা। কাটা দরজা দিয়ে তুজনের কথা শোনা যাচ্ছে।

ডাঃ চাটুজ্জে বলছেন, ছাখ ইংলণ্ড ঘুরেছি, কন্টিনেণ্ট ঘুরেছি, মিশর গেছি কিন্তু কোথাও তোমার মত স্থন্দরীর আর জুড়ি দেখিনি। ভৌমিক চোখ টিপে বললে, ঘাঘু শিকারী মাইরি।

ব্যাটাচ্ছেলে চারে কেমন মেথি ভেজে ঢালছে ছাখ। ছুকরী টোপ গিললে বলে। ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলুম, মিস্ গ্রিফিথ্ মুখ নীচু করে একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। গাল ছুটো মাঝে মাঝে রাঙ্গা হয়ে বোম্বাই করমচা হচ্ছে। আর চাটুজ্জে 'লাবলি' 'হাউ সুইট' বলে ইস্টিম বজায় রাখছে। শেষ পর্যন্ত ডাঃ চাটুজ্জে মিস্ গ্রিফিথের একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ভৌমিক বললে, আরে মোলো মোষ নাকি রে। যা থাকে কপালে আজ এক ইন্সিন্ডিয়ারী বম্ (আগুনে বোমা) ঝাড়ব। ডাঃ চাটুজ্জের প্রশস্তি শুনে মিস্ গ্রিফিথ্ যা বললে, তার বাংলা তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়ঃ কেন আমড়াগাছি করছ। ছুষ্টু কোথাকার! আমি কি পুরুষ মানুষদের চিনিনে, বলবার সময় মেয়েদের যা বল তার সিকির সিকিও যদি মনে মনে মানতে তা হলেও তো বর্তে যেতুম। যাও আর ছুষ্টুমি না করে 'লেসন'টা (পাঠ) তাড়াতাড়ি করে শিখিয়ে দাও। ঢের ফুলিয়েছ, আর না। জান তো ক্ষমতার বেশী পাম্প করলে সব টায়ারই ফেটে যায়। ডাঃ চাটুজ্জে বললেন, এ আমার মনের অতি সত্যি কথা মাইডিয়ার। বাইবেলের বাণীর মত সত্যি। মোজেসের 'টেন কম্যাণ্ডমেন্টস্'-এর মতোই সত্যি আমার এ হৃদয়ের 'কম্যাণ্ডমেন্টস্'। ভৌমিক আর আমি ডাক্তারের কাণ্ড দেখে হেসে ফেললুম। ফিসফিস করে ভৌমিক বললে, ব্যাটা যে

পুরো পাদ্রী বনে গেল রে। যেভাবে বাইবেলতত্ত্বে আর প্রেমতত্ত্বে লাবড়া বানিয়ে চলেছে তাতে কিন্তু আমার সেই সন্দেহই হচ্ছে। মিস্ গ্রিফিথ্ কপট ক্রোধে একটু জোরেই বলে উঠল, চুপ চুপ, ইউ নটি (দুষ্টু)।

আরে আরে। আমি কিছু বলবার আগেই দেখি ভৌমিক দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। শুনতে পেলুম পরিষ্কার চোস্ত ইংরেজীতে অতিশয় গম্ভীরভাবে ও এক বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। ভুল করলে ম্যাডাম 'নটি' (দুষ্টু) নয়, ওটা 'নট' (গেরো)। কি মাথার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছে বুঝি, তা ওর 'নট' তো সোজা। 'নট'ও অবিশ্যি কখনও কখনও 'নটি' হয়। তবে একটু সাবধান থাকলেই সে 'নট' এড়ানো যায়। তোমার তো বুদ্ধি-সুদ্ধি খুবই চোক্তা আছে ম্যাডাম, তুমি সে 'নটে'র ফাঁসে গলা দেবে কেন? এটুকু গৌরচন্দ্রিকা করেই সে মাথার ব্যাণ্ডেজ সম্বন্ধে পুরো একটা বক্তৃতা ঝেড়ে দিলে পনের মিনিট ধরে। বক্তৃতা শেষ হতেই মিস্ গ্রিফিথ্ উঠে পড়ল। ভৌমিককে বললে, তোমার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ। ভৌমিক বুড়ো পাদ্রীর ঢঙে বলে উঠল, কিছু না কিছু না, পবিত্র কর্তব্য করেছি মাত্র। গুড্ ইভনিং বলে মিস্ গ্রিফিথ্ বেরিয়ে আসতেই তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলুম। লজ্জায় নুয়ে পড়ল তার দুটো বিনম্র চোখ। একটু ঠাট্টার ছলে বললুম, গুড্ ইভনিং। ইভনিং বলে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল।

ভৌমিক একখানা চেয়ারে জেঁকে বসল। তারপর বললে, কি দাদা, শীতকালটা ভালই কাটছে, কি বলেন? ডাক্তার সাহেব বেজায় ভড়কে গেলেন। ভৌমিক ডাক দিলে, বাইরে কেন রে ভেতরে আয় না। ভেতরে ঢুকলুম। দেখলুম বাঘা ডাক্তার একেবারে কেঁচো-কেঁচো। বললেন, আপনাদের জন্যে যদি কিছু করতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করবো। ভৌমিক হো হো করে হেসে আবহাওয়াটা তরল করে নিলে। বললে, আমাদের থেকে ভয় পাবার কিছু নেই মশায়। আপনার কাজ নির্বিঘ্নে গুছিয়ে নিন। দিন সিগ্রেট দিন। সিগ্রেট খেয়ে, আড্ডা দিয়ে, ডাক্তার চাটুজ্জেকে মাইডিয়ার বানিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরে এলুম, তখন আমাদের খাবার ঘণ্টা পড়েছে।

ভৌমিক গুঁতো মারতেই ঘুম ভেঙে গেল। ভৌমিক বললে, পৌনে বারটা, ওঠ। তাড়াতাড়ি করে উঠলুম। বুটপট্টি বাঁধলুম। ওভার কোট চাপিয়ে লোহার টুপী পরে গেটের দিকে এগিয়ে গেলুম মশমশ। ডিউটিতে ছিল পানীগ্রাহী আর ইন্দর সিং। ওদের এবার ছুটি, আমাদের পালা শুরু হবে। পানীগ্রাহী হেসে সিগ্রেট দিল। তারপর দুজনে চলে গেল। সিগ্রেট টানতে টানতে শুনতে পেলুম দুজোড়া ভারী বুট নুড়ি পাথরের রাস্তা ধরে ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিলীয়মান শব্দ সেই অন্ধকার নিষ্প্রদীপ রাত্রে যেন দুটো স্পষ্ট অবয়ব ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। ভৌমিক পেট্রল দিচ্ছে, আমি দোর আগলে

দাঁড়িয়ে। রাত বাড়ছে। আমার হঠাৎ মনে হল এই কলকাতা যেন একটা হ্রদ। আর অন্ধকারটা যেন জল। সাঁতারু রাত্রি চলেছে এই অন্ধকারে সাঁতার কেটে কেটে ভোরের পাড়ের দিকে। সদ্য কাটা জঙ্গলে গেলে যেমন ফাঁকার অস্তিত্বটা খুব প্রকট ঠেকে, এই নিষ্প্রদীপ রাত্রে আকাশটার অস্তিত্ব তেমনি বিশেষ হয়ে ধরা দিল। আকাশে মেঘ নেই দেখে খোকা-খুকু তারারা জানালার কপাট হাওদা করে খুলে দিয়ে নির্ভয় কৌতূহলে আশ মিটিয়ে পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছে। আমার হঠাৎ মনে হল, আমাকেও দেখতে পাচ্ছে কি? মনে হতেই মোটা থামের আড়াল ছেড়ে ফাঁকায় এসে দাঁড়ালুম। উপরে চেয়ে দেখি ডানায় লাল নীল বাতি জ্বেলে দুখানা বড় বড় বোমারু উড়ে চলেছে। হয় তো ব্রহ্মদেশে, হয় তো ফিলিপিনে, হয় তো বা আফ্রিকার দিকেই, কোথায় কে জানে?

গীর্জায় ঘড়িতে একটা বাজল। আর একটি ঘণ্টা। তারপরেই ডলবি আর ফজলে করিমের হাতে ডিউটির বোঝা তুলে দিয়ে খাটিয়ার বুকে পড়ব। মশমশ শব্দ হচ্ছে ভারী বুটের। ভৌমিক টহল শেষ করে ফিরে আসছে। এবার আমার পালা।

রঁদে বার হলুম। পিছু ফিরে দেখি ভৌমিকের মুখের সিগারেটের আগুন কখনো প্রখর হচ্ছে, কখনো বা ঝিমিয়ে পড়ছে। আলীপুর রোড ছেড়ে ঢুকে পড়লুম জজকোর্ট রোডে। আমাদেরটা ছাড়ালেই আমেরিক্যান সৈন্যদের একটা ব্যারাক।

দেওয়ালের ছায়ায় শরীর ঢেকে ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ শুনতে পেলুম চাপা কান্নার আওয়াজ। একটু এগিয়েছি কি শুনলুম, হল্ট, হু কম্‌স্‌ দেয়ার? সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে জবাব দিলুম, এ. আর. পি. সেন্ট্রি। হেল্লো। এস এস। ব্যাপার কি? এগিয়ে দেখলুম, দুটো ইয়াঙ্কীতে মিলে স্টেন গান বাগিয়ে মাল ভর্তি ঠেলায় বসা দুটো লোককে খুব ধমক ধামক দিচ্ছে। আর ঠকঠককাঁপা লোকদুটোর মুখ দেখে মনে হল তারা পরিত্রাহি মনে মনে ইষ্টমন্তর জপে চলেছে। ঠেলাটা ভর্তি প্যাকিং বাক্স, হঠাৎ একজন ধমকে উঠলে, জ্যা-আও, ভাগো। ঠেলাঅলা দুটো দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান হারিয়ে দে ছুট। তাই দেখে ইয়াঙ্কী দুটোর কি হাসি! প্যাকিং বাক্সগুলো ভেতরে ঢুকোতে ঢুকোতে আমাকে দেখেই বললে, নিয়ে যাও দোস্ত, লুটকা মাল। একটা বাক্স উঠোতে পারি এমন শক্তি এই মরখুণ্ডে হাড়ে নেই। তাই ছুটলুম ভৌমিককে খবর দিতে। সব শুনে ভৌমিক বললে, তুই দাঁড়া এখানে। বলেই পিঠটান। আধঘণ্টা বাদে দুটো বোতল নিয়ে এল। একটা ভেঙ্গে খেতে খেতে বললে, শুরু কর, এ লেমনেড্‌।

পর দিন বিকেল হতে না হতেই মিলিটারি পুলিসে ছেয়ে গেল। গোটা ব্যারাকটাতে কি জোর সার্চই না হল। কিন্তু কোনো কিছুরই পাত্তা মিলল না। কোন হদিস, কোন চিহ্ন নেই। হতাশ হয়ে পুলিস চলে গেল। ভৌমিক বললে, ইয়াঙ্কী ব্যাটাদের

মাথায় গোবর মাইরি! কেলেঙ্কারি হত আরেকটু হলে। ব্যাটাচ্ছেলেরা ঠ্যালাটাকে দরজার সামনে রেখেই ভেগে পড়ছিল। অনেক করে বুঝিয়ে বলে দিলুম, ঠ্যালাটা অন্যত্তর পাচার করে দিতে। নইলে কি হতো বুঝতে পারছিস্? শেষ পর্যন্ত ঠ্যালা গাড়ীটার হদিস মিলল মাঝেরহাট ব্রিজের কাছে।

কিসের থেকে কি হয় বলা যায় না। সামান্য মস্করা দিয়ে যার শুরু, তাই শেষ হল একটা তুলক্লাম কাণ্ডে।

সন্ধ্যের সময় মাঠে বসে আড্ডা দেয়া হচ্ছিল। আমাদের দলটির সেদিন ছুটি। হঠাৎ বচন সিং-এর সঙ্গে চাটগাঁইয়া মুফিজুলের কথা কাটাকাটি শুরু হল। বচন সিং ষণ্ডা মানুষ, কিন্তু আওয়াজটি তার ময়ূর ময়দার মতোই মিহি। মুফিজ মিঞা শরীরে তুবলা কিন্তু হাঁকাড়ে মুলতানী ষাঁড়। আওয়াজকে যদি ঘনত্ব দেয়া যেত তবে সেদিন সেই এ. আর. পি. ময়দানে আর একটি পানিপথের লড়াই ফতে করত মুফিজ। শিখের পো'কে সেখের বাচ্চা শিকপসিন্দা বানিয়ে ছাড়ত। তবে ফাঁকা আওয়াজ বাতাসে ডিগবাজি খাওয়া ছাড়া আর কোথাও সুবিধে করতে পারে না। শিখেদের মোটা বুঝ। বচন সিং তেড়ে উঠল, থাম থাম, তুই তো আমার বেটার বয়সী। মুখ চিপলে এখনও ছানা কাটা দুধ বেরোয়। তোর সঙ্গে তর্ক করবো কি? মুফিজ চড়বড় করে উঠল, তা বটে তা বটে, আমার মামা হবার বয়েস তোর হয়েছে বটে।

আর যাবে কোথায় ? মামা ! শিখের ঘরের মেয়ে যাবে সেখের ঘরে ! সাপের বাচ্চা ঘর নিকুবে ভেকের। বটে ! বচন সিং আচমকা মারলে এক আখাম্বা থাপ্পড়। শিখদের সহজে বাত চলে না, হাত চলে। তক্ষুণি এক হৈ হুড়ুধ্বুম বেধে গেল। দুজনে দুদল পাকালে। আমি, ভৌমিক, ডলবি, ফজলে করিম নিরপেক্ষ দর্শক বনে মজা দেখতে লাগলুম।

বেশীক্ষণ মজা দেখে আর চলল না। ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। ফজলে করিম রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে টেনে তুললে। কি ব্যাপার ? খুব গুরুতর। ফজলে করিম তড়বড়িয়ে যা বললে তার সারাংশ হচ্ছেঃ বুদ্বুগুলো বেওকুফির চূড়ান্ত করে ফেলেছে। সন্ধ্যের ব্যাপারটা ধর্ম অবধি টেনে নিয়ে দু'দলেই মালকোঁচা আঁটছে। কাল একটা ফয়সলা করে তবে সোয়াস্তি। লোক ভাড়া করতে এরা খিদিরপুরে গেছে, ওরা ভবানীপুর। হাবিলদার লাল সিং-এর কাছে চল। স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হালদার সাহেবের কাছে চল। একটা ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করে ফেলা যাক !

সেই রাত্রে ছুটাছুটি করলুম। লাল সিং-এর ঘুম ভাঙালুম। আধঘণ্টা ধরে ব্যাপারটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কে শোনে ? লাল সিং-এর সেই এক কথা, 'ইস্‌মে ক্যায়া হ্যায়, লড়নে তো দো। ফয়সলা আপসে আপ হো যায়গা।' বুঝিয়ে বুঝিয়ে হদ্দ হয়ে গেলুম তবু ওর 'ইস্‌মে ক্যায়া হ্যায়' আর ঘোচাতে পারলুম না। ভৌমিক বললে,

সেরেছে, ওকে পুলিসে পেয়েছে বুঝলি, দশ মিনিট চুপ করে থাক। ওর বুদ্ধিসুদ্ধিগুলো একটু থিতুতে দে। ভূতে পায়, পেত্নীতে পায়, পেঁচোয় পায় জানি। কিন্তু পুলিসে পাওয়া আবার কি? দশ মিনিট বসে বসে মশা মারলুম চুপ চাপ। কারো মুখে কথা নেই। হঠাৎ ভৌমিক শুরু করলে, লড়াই করতে ডিসিপ্লিনই হল আসল, কি বলো হাওয়ালদারজী। লাল সিং চটপট বললে, জরুর। তবেই ছাখ, এরা যে এই ডিসিপ্লিন ভাঙছে এটা বন্ধ যদি করতে না পারি তবে আমরাও তো ডিসিপ্লিন রাখতে পারলুম না। কি বলো? বুড়ো শঙ্কিত হয়ে বললে, জরুর। আর ডিসিপ্লিনই যদি গেল তবে আমাদের রইলো কি? বুড়ো মলিনভাবে বললে, কুছ নেহি। তাহলে আমাদের মান সম্ভ্রম মাটি হয়ে গেল কি না? বুড়ো বললে, জরুর। ভৌমিক তখন আবেগ দিয়ে বলতে লাগল, আমাদের কথা ছেড়ে দাও, আমরা নতুন, আমাদের আবার সম্ভ্রম সম্মান কি? কিন্তু তুমি হাওয়ালদার সাহেব, তুমি তো খানদানি সিপাই, জঙ্গী পেনসন পাও, তুমি এখানে থাকতে যদি আজ ডিসিপ্লিনের খেলাপ কাজ কেউ করে বসে, তখন তোমার সম্মানটা কোথায় থাকবে? সাহেবরা শুনে বলবে কি? তোমার হাতে ডিসিপ্লিনের রশি তুলে দিয়ে সাহেবরা ঘুমুচ্ছে, আর কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে ওরা কি রকম খাপ্পা হয় তাও তো জানো। লাল সিং আর শুনতে চাইল না। বললে, ঠিক বাত। ঠিক

কথা। আমি এখনই গুরুদ্বারায় যাচ্ছি। সব ঠিক করে ফেলেছি। তোমরা যাও।

বাইরে বেরিয়ে ভৌমিক বললে, বাব্বা, জল তেষ্টা পাইয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, পুলিসে পাওয়াটা কি রে? ভৌমিক আমাদের দিকে একবার চেয়ে নিলে, তারপর হেসে বললে, পুলিসে পাওয়া জানিসনে? তবে শোন—

এক সর্দারজীর ভাই লাহোরে পুলিসের চাকরি করত। একদিন সর্দারজী তো ভাইকে দেখতে গেছে। রাতে খাওয়া দাওয়া চুকলে ঘুমুতে যাবার সময় সর্দারজী বললে, 'গ্যাখরে ভাই, আমাকে কিন্তু ভোরে তুলে দিস। অনেক কাজ ফেলে এসেছি। রাত একপর থাকতে রওনা দিতে চাই।' পরদিন তো ভাই ওকে রাত থাকতেই তুলে দিয়েছে। সর্দারজী আলো টালো না জ্বালিয়েই হাতের কাছে জামা কাপড় পাগড়ি যা পেল পরে তো বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে এক পুকুরের কাছে এসে যখন পৌঁছুল, তখন বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। সর্দারজী ভাবলে মুখ হাত এখানেই ধুয়ে নিই। পরিষ্কার টলটলে জল পুকুরের, আয়নার মত—মুখ দেখা যায়। জলে মুখটা দেখেই সর্দারজী বেজায় রেগে গেল। বিড়বিড় করে বললে, 'তাহলে এই জন্যেই লোকে পুলিসকে খচ্চর বলে থাকে। ভাই বন্ধুর বাছবিচারও ওদের কাছে নেই। আমার মায়ের পেটের ভাই ও, এত করে বললুম, আমাকে সকাল সকাল তুলে দিতে, আর

ব্যাটাচ্ছেলে কিনা নিজেই উঠে চলে এসেছে ? ব্যাপারটা বোঝ। হয়েছে কি অন্ধকারে সর্দারজী পুলিসের পাগড়িটা চাপিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল, জলে পড়েছে তারই ছায়া। সর্দারজীকে আর কেউ বোঝাতে পারে না যে, সে-ই উঠে এসেছে। যাকে পায় তাকেই কাহিনীটা শুনিয়ে বলে ওঠে, বল দিকিনি ভাই, কি খচ্চর এই পুলিসগুলো! মায়ের পেটের ভাইকেও বিশ্বাস করতে নেই। এত করে বললুম, সকাল করে আমাকে উঠিয়ে দিতে তা ব্যাটা খোদ উঠে চলে এল। যে শোনে সেই বলে, তাইতো, এ তো বেজায় বদমাশি। শেষ পরে ওদের মধ্যে একজন চতুর লোক পুলিসের পাগড়িটা ওর মাথা থেকে খুলে ফেললেন। তখন সর্দারজীর বুদ্ধির গোড়ায় আক্কেলের ধোঁয়া লাগল।

হাসতে হাসতে পেটে প্রায় চটা উঠে যাবার দাখিল হল। রাত অনেক হয়েছে। ঘুমে চোখ ভেঙে পড়ব পড়ব। ফিরে এসে খাটিয়া সই হয়ে ঘুমের কম্বলখানা গায়ে টেনে দিলুম।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলুম তোড়-জোড় প্রচুর। রণং দেহি রণং দেহি করে গোটা এ. আর. পি. সেণ্টারটাই ভঁয়সা নাচন নাচতে লেগেছে। এদিকে মুফিজ কোম্পানী ফাটা বাঁশ নিয়ে পায়তাড়া ভাঁজছে। ওদিকে বচন সিং ইন্দর সিং লিমিটেড ঘ্যাঁসঘ্যাঁস মরচে ধরা গুরু গোবিন্দ সিং-এর আমলে নাঙ্গা কৃপাণে শাণ লাগাচ্ছে। আটকাতে পারতেন গঙ্গাসাহেব,

তিনি ছুটিতে। আর পারত হাবি দার লাল সিং, সেও সকাল থেকে না পাত্তা। বোধহয় সব লাল হো যায়েগার সম্ভাবনা আগে ভাগে দেখতে পেয়েছিল। ভেগে পড়ে মান জান দুই-ই বাঁচালে। এখন আছি আমরা। আমি, ফজলে করিম, ভৌমিক আর ডলবি। কত্তে কম্মাতে এই চারই। ভৌমিক বললে, ঘোলালে, সত্যি সত্যি একটা কিছু হলে, সে কেলেঙ্কারি মাইরি ঝামা ঘষেও ওঠান যাবে না। একটা কিছু করা দরকার। ফজলে ভাই, তুমি ওদিকটা যে করে পার সামলাও। আমি আর ডলবি এ দিকটা দেখি। আমাকে বললে, ডিপো ইন্‌চার্জের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বল, একটা কিছু করুক।

ইংরেজ জাতটার রসিক বলে বরাবর একটা সুনাম আছে। বোধ করি সেই নামটা বজায় রাখতেই আমাদের নতুন ডিপো ইনচার্জ হালদারমশাইকে ওরা ডি-এস-পি বানিয়েছিল। হালদার সাহেবের কোয়ার্টারে যখন গেলুম, তখন তিনি কড়া দাড়িতে সাবানের মালিশ লাগাচ্ছেন। বে-আফৎ ক্ষুরটায় চকচকে ব্লেড পরিয়ে টেবিলের উপর তৈরী রেখেছেন। আমাকে দেখেই কালো মুখখানা আরো কালো করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি, চাই কী ? বললুম, ব্যাপারখানা স্যর বড্ড গুরুতর। একটা হাঙ্গামা হবার আশঙ্কা আছে। শিগ্‌গির একটা বিহিত করুন। হালদার সাহেব থরথর করে কেঁপে উঠলেন, কী, কী বল্লে ! কথাটা যেন আর কারও মুখ দিয়ে বেরুল। ওর ঘরের জানালাটা

দিয়ে ইন্দর সিংদের ওধারটা দেখা যাচ্ছিল। দুজন বসে বসে কৃপাণে শাণ দিচ্ছে। রোদ পড়ে চকচকে কৃপাণ চিকচিক করে উঠছে।

সেদিকটা দেখাতেই হালদার সাহেব চোখ দুটো বুঁজে ফেললেন। কাতলা মাছকে ডাঙ্গায় তুললে সে যেমন বাতাস গিলতে থাকে, তেমনিভাবে বাতাস গিলতে লাগলেন হালদার সাহেব। ব্যস্ত হয়ে বললুম, স্যর। আমার কথা কানে যেতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। তারপর কোন দিকে না চেয়েই ফোন লক্ষ্য করে দিলেন এক লাফ। আমি তো হতভম্ব। ফোনটা তুলেই বললেন, হ্যালো। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল খোলা জানালাটার দিকে। আবার এক লাফ মেরে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁর নজর পড়ল আমার দিকে। গর্জন করে উঠলেন, অ্যাই, কী চাই এখানে? বাহার যাও। গেট আউট। এক ধাক্কায় আমাকে বার করে দিলেন ঘর থেকে। ঘরের দরজায় খিল পড়ল।

নিচে এসে দেখি হাওয়া বদলে গেছে, সব মিটমাট। ফজলে করিম ফাঁটা বাঁশ সামাল দিয়েছে। চকচকে কৃপাণকে ঘুম পাড়াবার বন্দোবস্ত করেছে ভৌমিক। ইস্তিক বচন সিং আর মুফিজের মধ্যে ‘মাফি মাঙা-মাঙি’ও শেষ। বুক থেকে পাথর নামল। একটা পাম গাছের ছায়ায় বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা দিতে শুরু করলুম। অকস্মাৎ তীব্র সিটি বাজিয়ে

আর্ম পুলিসের একটা লরী এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। তারপর আর একটা। আরো একটা। আরে ব্বাপস্! ব্যাপার কী? পটাপট লরী তিনটে খালি হয়ে গেল। একটা ঐরাবত প্যাটার্নের গোরা সার্জেন্ট পিস্তল বাগিয়ে তেড়ে এল। আবার মোটরের হর্ণ। কী সর্বনাশ! পুলিস কমিশনার। আবার হর্ণ। কি ব্যাপার? এ. আর. পি.র হর্তাকর্তাও এসে গেছেন। ওদের সব্বাইকার মুখে দেখি একটা ভীষণ উদ্বেগের ভাব। কমিশনার সাহেব আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার! ভৌমিক বললে, কিসের ব্যাপার স্যর? সাহেব একটু আশ্চর্য হলেন, কেন, তোমাদের এখানে দাঙ্গা হচ্ছে না? আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। ভৌমিক বললে, দাঙ্গা কি স্যর? কোথায় দাঙ্গা?

এবার সাহেবদের চক্ষু পামগাছে উঠল। বললেন, তাজ্জব। সাহেব দুজন খানিকটে কি পরামর্শ করলেন, তারপর সার্জেন্টকে দলবল নিয়ে চলে যেতে হুকুম দিলেন। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ডিপো ইনচার্জ কই? সাহেবদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললুম, হালদার সাহেবের কোয়ার্টারে।

বন্ধ দরজায় ঘা দিলুম। ভেতর থেকে চীৎকার শুনলুম, কে? বললুম, স্যর, দরজা খুলুন। অনেক বলতে কইতে দরজা খুলল। হালদার সাহেবের চেহারাটা দেখে অতিকষ্টে হাসি চাপলুম। চোখ বসে গেছে। দাড়িতে সাবান শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে আছে।

পোশাক আশাকের অবস্থাও খুব সুবিধের নয়। আমার পেছনে সাহেবদের দেখে হালদার সাহেবের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল। গুডমর্ণিং স্যর, আস্তে আজ্ঞা হোক। আমার উপর তম্বী করে বললেন, কুর্সি লাও।

কমিশনার সাহেব বললেন, না থাক। তারপর গোলমালটা কি? হালদার সাহেব এবার যেন কূল পেলেন। বড় করে বলে চললেন, ওঃ দারুণ ব্যাপার স্যর। রায়ট। তলোয়ার, ছোরা, সব মারাত্মক অস্ত্র। ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় ফোন করতে বাধ্য হয়েছি।

কমিশনার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, খুন জখম কিছু হয়েছে? হালদার সাহেব বললেন, নিশ্চয়। তবে সংখ্যাটা সঠিক বলতে পারব না। সাহেব দুজন চোখাচোখি করে বললেন, তাহলে চলুন, ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে আসা যাক।

হালদার সাহেব ঘুম ভেঙ্গেই বোধ হয় নিজের মুখখানা দেখেছিলেন। নইলে গোটা জীবনের জড়ো করা জল এক সকালেই এমন ঘোলা হয়ে যাবে কেন! বেচারার চাকরিটি গেল।

দড়ির ঝোলায় করে ওপর থেকে লোক নামানো আমাদের একটা প্রধান কাজ ছিল। একদিন তিনতলার ওপর থেকে বচন সিংকে নামাচ্ছিলুম, এমন সময় দড়িটি ফস্‌কে গেল। হু হু করে নামতে লাগল বচন সিং। চীৎকার করে উঠল। একতলার

লোকদের চীৎকারও শুনতে পেলুম, হুঁশিয়ার। আমার সমস্ত শক্তি একত্র করে, দাঁতে দাঁত চেপে, জানালার গরাদে দু-পা আটকে দড়িটা কোমরে জড়িয়ে মেঝের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। দড়িটা একটা আকস্মিক ঝাঁকানি খেয়ে পটপট করে উঠল। কোমরটাতে একটা ঝাঁকানি খেলুম। শিরদাঁড়াটা মট্ করে উঠল। চোখ বুঁজে তেমনিভাবে পড়ে রইলুম। নীচ থেকে একটা আওয়াজ শুনলুম, 'শাব্বাশ। ঢিল দাও! আড়িয়া।' কিন্তু আর কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কেমন একটা ঘুম আসছিল। চোখদুটোকে খুলে রাখবার অনেক চেষ্টা করলুম। সব আবছা, সব ঝাপসা হতে লাগল। মনে হতে লাগল কোথায় যেন ঝিঁঝি ডাকছে। কোথায় যেন গান হচ্ছে। একটা ময়াল সাপ আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে। কোথায় যেন কাঠঠোকরা ঠক্ ঠক্ শব্দ করছে। আমার কানের কাছে কি ? খট্ খট্ ঠক্ ঠক্। অস্পষ্ট শুনতে পেলুম, কে যেন বললে, ডলবি দড়িটা খুলে নাও। আঃ! অনেকখানি বাতাস ঢুকল বুকে। কে যেন বললে, ভৌমিক ওকে তুলে নাও। আমাকে কারা যেন একখানা ভেসে যাওয়া মেঘের উপরে শুইয়ে দিলে।

চোখ মেলতেই দেখলুম ডাঃ চ্যাটার্জিকে। মৃদু হেসে বললেন, ইউ আর অল রাইট। তবে দিনকতক পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। থাকুন এবার আমার খপ্পরে। ডাঃ চ্যাটার্জির হাসিটি বড় মধুর লাগল।

দিন পাঁচেক পড়ে রইলুম এ. আর. পি. হাসপাতালের ছোট্ট কামরাটায়। একটা দুটো করে নিশ্চুপ, নিশ্চল, ব্যস্ততাহীন দিন কাটতে লাগল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভৌমিক আসত। ছুটি হলে আসত ফজলে করিম, ডলবি। আর আসত গঙ্গাসাহেব। প্রতিদিন গল্পসল্প করে যাবার সময় বুড়ো হাতখানায় ঝাঁকানি মেরে বলে উঠত, কিছু হয়নি। সেরে উঠবে। সকলে মিলে ওই একই কথা বলত। কিন্তু কি যে আমার হয়েছে তা কেউ বলত না। নিজেও জানতুম না। বুকে ভীষণ ব্যথা টের পেতুম। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হত। নড়াচড়া একদম বারণ।

ডাঃ চ্যাটার্জি সত্যিই অনেক করলেন। কিন্তু রোগ সারাতে পারলেন না। বুকের ব্যথা বেজায় বেড়ে উঠল। রাতে ঘুম হোত না। জ্বর আর ছাড়ে না। সেদিন চুপ করে শুয়ে শুয়ে দুপুর বেলাকার স্তব্ধতাটা অনুভব করছিলুম। কেউ কোথাও নেই, শুধু শীতের শেষের পাতা ঝরার যেটুকু চাঞ্চল্য। হঠাৎ ভৌমিক এসে বললে, তোকে বড় হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। ডাঃ চাটুজ্জে গঙ্গাসাহেবকে বলছিল শুনছিলুম। ওকে কেমন অন্যমনস্ক দেখলুম। আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, কটা মাস একসঙ্গে বেশ কাটালুম। ব্যাপার-স্যাপার যা বুঝছি, তোকে আর এ. আর. পি.র অন্ন খেতে হবে না। আচ্ছা চলি এখন। ভৌমিক তাড়াহুড়ো করে

বেরিয়ে গেল। যদি ভুল না দেখে থাকি তো, ঠিক ওর চোখতুটো ভিজে ভিজে হয়ে এসেছিল। সেইদিনই বিকেলে একখানা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল।

ভর্তি হয়ে গেলুম বড় হাসপাতালে। সরকারী রিজার্ভ সিটের একটায় আমার জায়গা হল। ওয়ার্ড নম্বর কে, বেড নম্বর আট। মস্ত বড় হলঘরখানা। ধোয়া-মোছা পরিষ্কার। আয়োডোফর্মের গন্ধটা নাকে আসতেই মনে পড়ল আরো একদিন এ গন্ধটা পেয়েছিলুম, বুড়ো ম্যাকডুগলের মৃতদেহ দেখতে যেদিন শম্ভুনাথ হাসপাতালে গিয়েছিলুম।

হাসপাতালে যেতে চাইনে একটিমাত্র কারণে, নিজেকে ভয়ানক রিক্ত মনে হয় বলে। নিজের ভাবনাগুলো, অনুভূতিগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে এলোমেলো হয়ে যায়। মনে হয় যেন সে কোলের কাছে গুটিশুটি মেরে আছে। যেদিন হাসপাতালে আসি তার তুদিন পরে চার নম্বর বেডের রোগীটি মারা যায়। সন্ধ্যের সময় হঠাৎ ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে ঘেরা পর্দাটা একজন ঠেলে আনলে। চার নম্বর বেডটাকে বেশ করে ঘিরে দিলে। চেয়ে চেয়ে দেখলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙতেই চার নম্বর বেডের দিকে নজর পড়ল। খালি। ধক্ করে এক ধাক্কা খেলুম। পরদিন রাত আটটার সময় কেবল ঘুমটি আসছে, হঠাৎ ঘেরা পর্দার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কানে গেল। আমার অনুভূতিগুলো তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল! উত্তেজিত হয়ে

উঠলুম। পাঁচ নম্বরকে ঢেকে দিলে সেদিন। বুকটা কি জানি কি উত্তেজনায় টিপটিপ করতে লাগল। পরদিন দেখলুম পাঁচ নম্বর বেডটিও খালি। হঠাৎ কেন যেন আমার মনে হল আজ তাহলে ছ' নম্বরের পালা। কাল সাত নম্বরের। আর পরশু? মনে পড়ল আমার বেডের নম্বর হচ্ছে আট।

তাহলে একটা পরিসমাপ্তিতে এসে পৌঁছলুম। যাক্ এবার নিশ্চিন্ত। সেই রাতে সমস্ত লোমকূপগুলোকে জাগিয়ে রেখে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। আটটা বাজল। ন'টা বাজল। এখনও আসছে না কেন ঘেরা পর্দাটা। ওই শব্দ হচ্ছে না ক্যাঁচকোঁচ? ইঁদুর। এগারোটা। কি আশ্চর্য এত দেরি করছে কেন? বারোটা। আজ ছয় নম্বরের পালা। একটা, দুটো। তবে কি ও ফাঁকি দিলে? মৃত্যুকে ফাঁকি? সর্বশরীর ঘামতে লাগল আমার। কী এক ভয়ানক অস্বস্তি। গা ফুঁড়ে গল গল করে ঘাম বেরুচ্ছে। ডাক দিলুম, নার্স। সাড়া পেলুম না। আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরিয়েছে তো? জোরে ডাকলুম, নার্স। এবারে নার্সটি চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এল। কেমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। ওর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে মৃত্যু এসে অতর্কিতে চড়াও হবে ছ' নম্বরের ঘাড়ে। আর ও দিব্যি ঘুমুচ্ছে। মৃত্যু বোধ হয় নার্সদের ছোঁয় না। ওদের যে বেড নম্বর নেই। আমার মনে হল, আমরা এই বেডে-শোয়া রোগীরা যেন টোপ। আমাদেরকে খুঁটোয় বেঁধে কেউ যেন

মাচার ওপর বন্দুক হাতে বসে আছে শিকার করবার জন্য। রুক্ষস্বরে বলে উঠলুম, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না কেন? সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মৃদু হেসে নার্সটি জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই বলুন না। বিরক্ত হয়ে বললুম, ঘাম হচ্ছে। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে নিপুণ হাতে তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিলে। পাউডার ছড়িয়ে সব গোছগাছ করে ও চলে যাচ্ছিল, ডাকলুম, নার্স। মৃদু হেসে ফিরে দাঁড়াল। বললুম, জল খাব। জল এনে যত্ন করে খাইয়ে দিলে। চলে যাবার জন্য যেই ফিরেছে আবার ডাকলুম, নার্স। তেমনি মৃদু হেসে বললে, আবার কি চাই? বললুম, দয়া করে একটু বসবেন? আপনাকে একটা কথা বলব। একটা টুল এনে ও বসলে। আমি বললুম, ছ' নম্বর আজ মারা যাবে। এখন একটু সজাগ থাকবেন। নার্সটি হেসে উঠে বলল, তাই নাকি? আচ্ছা থাকব। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন তো।

কিন্তু ছ' নম্বর মরল সেই রাতেই। চারটে বেজে যাবার একটু পরেই ঘেরা পর্দার চাকার কিচ্‌কিচানি শুনলুম। স্পষ্ট শুনতে পেলুম। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে বুকটা আমার খালি হল। কেমন যেন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম। অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার শেষ হতেই গভীর ঘুমে ডুবে গেলুম। আঃ, আগামীকাল সাত নম্বর। তার পরদিন? আমি।

সেই নার্সটির ডিউটি ছিল পরের রাত্রেও। ডিউটিতে এসেই

ও সটান আমার কাছে চলে এল। চোখেমুখে একরাশ বিস্ময়। শুধু বললে, কি আশ্চর্য। কি আশ্চর্য। আপনি কি করে জানলেন? ম্লান হেসে বললুম, আমি জানতুম।

আজ সাত নম্বর। কি অস্বস্তিকর রাত্রি। কি অস্বস্তিকর প্রতীক্ষা। নার্সকে চুপি চুপি বলে দিয়েছি। ও বিশ্বাস করেনি বুঝতে পেরেছি। ওর মুখে দেখেছি অবিশ্বাসের হাসি। ওকে হাসলে বেশ দেখায়।

এই নিয়েই ওর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। নাম বিলাসিনী রাউথ। বাড়ি ইম্ফল। এই বছরেই পাস করে বেরিয়েছে। এইমাত্র একটু হেসে বলেছিল, আপনার যত আজগুবি ধারণা। কিন্তু ধারণা মোটেই আজগুবি নয়, বোঝা গেল রাত এগারোটায়। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হল ঘেরা পর্দাটার চাকার। সাত নম্বরের বেডটাকে ঢেকে দেওয়া হল। ডাক্তার এলেন, অক্সিজেন এল, তিনটের সময় বেডটি খালি হয়ে গেল। বিলাসিনীর চোখ যেন ফেটে পড়বে, এমনি বিস্ময়। আমার দিকে চোখত্নটো বড় বড় করে চেয়ে রইল। আর কি? কালকে আমি। ওর দিকে চেয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। বললুম, একটু বসবেন। এতক্ষণ পরে হাসি দেখলুম ওর ঠোঁটে। বললুম, একা থাকতে বড্ড ভয় করে। মনে মনে ভাবলুম, কাল আমার পালা। মিনতি করলুম, আপনার হাতখানা একটু ধরতে দেবেন? মৃত্নু হেসে হাত বাড়িয়ে দিলে। ওর হাত ত্নখানা ধরলুম। কি নরম। কাল তো আমার

পালা। ক'টায় পর্দা আসবে কাল? সন্ধ্যেয়? রাত দুপুরে? না ভোর রাতে? কালই আমার পালা। বললুম, কাল কার পালা জানেন? আমার। বিলাসিনী বললে, আপনার না উত্তেজনা বারণ। কথা বলা নিষেধ। কিন্তু আজ আর হাসলে না। অবিশ্বাস করলে না। কেমন ভীতু ভীতু চেয়ে রইল আমার দিকে। কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, ও উঠে পড়ল। কে যেন ডাকল ওকে। চোখ বুঁজে পড়ে রইলুম অনেকক্ষণ। প্রতীক্ষা করে রইলুম কার। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লুম। চেতনা হারাবার আগে মনে হয়েছিল কে যেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তবে সে স্বপ্নও হতে পারে। আমার হাত দুখানা দিয়ে, মনে হয়েছিল যেন কার দুখানা নরম সুডৌল মসৃণ হাত চেপে ধরেছিলুম। তবে তা বালিশও হতে পারে। ঠিক জানিনে।

এটা জানি আমি মরিনি। সেদিন ঘেরা পর্দার চাকার ক্যাঁচকোঁচ শোনা গিয়েছিল। ঘেরা পর্দাটা এসে লেগেও ছিল। তবে আমার পাশের বেডে।

হাসপাতালে কাটিয়ে দিলুম দেড়মাস। অনেকেই দেখতে আসত। গঙ্গাসাহেব, হাবিলদার লাল সিং, ফজলে করিম, ভৌমিক, ডলবি এরা তো আসতই, এমন কি মিস্ গ্রিফিথ্ আর ডাঃ চাটুজ্জেও দুদিন এসেছিল। কি করে কার থেকে খবর পেয়ে জানিনে গৌরদাসও একদিন এসে হাজির। বললে, বেড়ে বাগিয়েছিস মাইরি। জিন্দা যাদুঘরের এই যা একটু আরাম,

বেশ মুফ্‌ত খ্যাঁট বাগানো যায়, কি বলিস। বলেই আলমারিটা খুলে ফেললে। একটু আগেই দুধ পাঁউরুটি দিয়ে গেছে। আগের দিনের জমা করা কিছু ফলও বোধ করি হামাগুড়ি দিচ্ছিল ভেতরে। দুধের মগটা একটু শুঁকে বললে, জিনিসটা ভালই, কি বলিস? বলেই পাঁউরুটিটুকু ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুধের ভেতর ফেলতে লাগল। চিনি নেই? বললুম, ছাখ কাগজে মুড়ে কোথায় রেখে গেছে। উঁকিঝুঁকি মেরে আলমারির ভেতর থেকে টেনে বার করলে চিনির মোড়কটা। খানিকটা মগের মধ্যে ঢালতেই বললুম, রোজ রোজ আর দুধরুটি ভাল লাগে না। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গৌরদাস সমবেদনার স্থরে বললে, কার আর ভাল লাগে বল। সে কথা জানি বলেই তো তোকে বাঁচিয়ে দিলুম। রুগী কি এই প্রথম দেখতে এলুম না কি? বলেই আমার দুধরুটির বরাদ্দটি চপাচপ বেমালুম হাওয়া করে দিলে। একটু সময় লাগলেও ধাক্কাটা সামলে উঠলুম! ক'বার করে তোকে খেতে দেয়? বললুম, চারবার। কি কি দেয় রে? বললুম, ডিম। ডিম ছায়? বাঃ বাঃ। আর? কলা। কলা? উঁ। তারপর? কমলা, আঙুর। আচ্ছা? সব মুফ্‌তসে? মাইরি রাজার বিছানায় শুয়ে আছিস, ঠেকছে। আবার আলমারির ভেতর চোখ ঢোকালে। বললে, মুরগির ডিম! আঃ কতদিন যে···কথা আর শেষ করল না, খুটুস করে ডিমটি ভেঙে গলায় ঢেলে দিলে। লেবুটেবুগুলো থাক বুঝলি, ও আমার খেতে তত

ভাল লাগে না। এমন ভাবে বললে যেন ওকে খাওয়াবার জন্য আমি এতক্ষণ মাথামোড় খুঁড়ছিলুম। বরঞ্চ কলা দু একটা··· কি বলিস? বলব আর কি? বলবার তোয়াক্কাই বা কে রাখে? শুধু বুঝে নিলুম, আলমারিটা আর গলাতে পারবে না নেহাত ওর মুখের ঘেরটা ছোট বলেই।

মুখটুখ পুঁছে গৌরদাস আরাম করে বসে বললে, আঃ, এবার একটা সিগারেট। তোদের তো সিগারেট দেয় না? এবার হেসে ফেললুম। বললুম, বুকের অসুখ, আমাকে সিগারেট দেবে কি রে? ওই কোণের বেডে যা, ওই যে সাহেবটা দেখছিস ও সিগারেট খায়। মুহূর্তের মধ্যে গৌরদাস ফিরে এল, হাতে দুটো সিগারেট। বললে তোর নাম করেও একটা নিয়ে এলুম, পরে খাব'খন, বুঝলিস্? এবার ওকে দোকানের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। গৌরদাস গরম হয়ে বললে, ও শালা মহাহারামী মাইরি। গোটাকতক বালব্ ঝেড়ে দিয়েছিলুম ওকে না বলে, তাই টের পেয়ে শালা চোরফোর বলে গালাগাল দিতে শুরু করলে। ছেড়ে কথা কইবার ছেলে আমাকে পাসনি। হাতের কাছে ছিল মাইরি একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, ঝেপে দিলুম কানচোয়াল সই করে। বাপ বলে বসে পড়ল তাই তাকটা ফসকে গেল। নইলে বেটাচ্ছেলে তখুনই ফিউজ্ হয়ে যেত। তা মাইরি আর রাখলে না। আমিও ছেড়ে দিলুম। তা বেশ করেছিস, এখন কি করছিস? গৌরদাস যেন নিবে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বললে, নিজের পায়ে কুড়ুল মারছি। বিস্মিত হলুম, সে কী! হেসে বললে আর বলিস কেন, সে মাইরি এক রামায়ণ। আমার এক দিদি আছে। বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। কি করি ওর জন্যে ঘর ভাড়া করতে হল। এখন তো আমি দস্তুরমতো ফ্যামিলি ম্যান। বেশ ছিলুম মাইরি, খাচ্ছিলুম দাচ্ছিলুম আর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। কপালে সইলো না, চাপল দিদির ঝামেলা। তাও কোন রকমে সামলে-সুমলে নিয়েছিলুম, ফ্যাকড়া তুললে দিদি। বললে, বিয়ে কর। সম্বন্ধও ঠিক করে ফেললে। দিদির খুড়শ্বশুরের মেয়ে। মা নেই। বাপের ওই একই মেয়ে। মেয়ের বাপও শুনলুম রাজী। বোঝ দিকিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গেই হাঁকিয়ে দিলুম। কোথাকার কে এক মেয়ে, ফোঁকটে এসে আমার গলায় দোলনা বেঁধে দোল খাবে। রাতদিন খিচিমিচি এই নিয়ে লাইফ্ মাইরি পাংক্চার করে দিলে দিদি। তাতেও আমি রাজী হইনি। গৌরদাস দম নিতে নিতেই বললুম, তবে আর গোলমাল কোথায়। তুই রাজী না হলে তোকে বিয়ে গ্যায় সাধ্যি কার? বিয়ে তো আর পান নয় যে দিদি চিবিয়ে তোর গালে ভরে দেবে। তুই ঠিক থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। গৌরদাস ঝেঁঝে উঠল, বাজে বকিসনে, সবটা শোন আগে। আজ সকাল অবধি তো ঠিকই ছিলুম। তাই নিয়ে তুমুল হয়ে গেল দিদির সঙ্গে। দিদিও রেগে রান্না-টান্না করলে না, ঘরে গিয়ে খিল দিলে। আমিও দশটা নাগাত

যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলুম। বেরুতেই তোর সেই খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলুম, তুই এই হাসপাতালে, বেশ কায়েমী বন্দোবস্ত করেছিস্। ভাবলুম, দেখা করতে আসব। যা হোক কাজকম্ম সেরে ঘুরতে ঘুরতে আসছি। হঠাৎ দেখি শিবনারায়ণ দাস লেন। দিদির ননদের বাসার গলি। নম্বরটা মনে ছিল। একটা মতলব ভেঁজে বাড়ীতে ঢুকে পড়লুম। শুনেছিলুম সে বাসায় মেয়ে আর মেয়ের বাপ, এক বুড়ো। কড়া নাড়তেই বুড়ো দরজা খুলল। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বললুম, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি। বুড়ো অমনি বলে উঠল, ও রমেশবাবুর ওখান থেকে? কে রমেশবাবু কে জানে, ঘাড় নেড়ে দিলুম, হ্যাঁ। ফন্দী করেছিলুম যোগেযাগে বুড়োর সঙ্গে আলাপটা জমিয়ে নিয়ে আমার নামে অ্যাসা লাগিয়ে আসব যে দিদি লাখটাকা গুনে দিতে চাইলেও বুড়ো আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার নামটি করবে না। ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রির এক সুবিধে, আর কিছু না হোক ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই থেকে মীটার দেখতে এসেছি বললেও যে কোন বাড়ীতে ঢোকা যায়। তা কপালগুণে ভালই লেগে গেল। বুড়ো বললে, রমেশবাবু যে বললেন, সন্ধ্যের আগে পাঠাবেন না। বললুম, আপনার জরুরি দেখে এখানেই আগে পাঠালেন। বুড়ো বললে, এসো এসো। তারপর কাজকর্ম দেখিয়ে দিয়ে বসে বসে তদারক করতে লাগল। সুযোগ পেয়ে আমিও এ-কথায় সে-কথায়

আমার পাশের বাড়ীর ছেলে বনে গেলুম। তারপর যা মুখে এল মাইরি তাই বলে দিলুম আমার নামে। চোর, বদমাশ, মাতাল গেঁজেল যা মনে এল। বুড়োর মাইরি আমার খুব হাই ধারণা ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে আর আমার জবাব শুনে চুবসে যায়। তারপর বুড়ো তো গুম মেরে গেল। বিয়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে খুশী মনে কাজকম্ম শেষ করলুম। তারপর হাত ধুতে গেলুম চৌবাচ্চার ধারে। সেইখানেই হঠাৎ মেয়েটাকে দেখলুম মাইরি। ঘুমুচ্ছিল বোধ হয়, চোখে মুখে জল দিতে এসেছে। আমাকে দেখেই সরে গেল। কিন্তু কি বলব ভাই, আমার কলজেটাকে কে যেন আখ মাড়াই কলের ভেতর পুরে পিষে দিয়ে গেল। গৌরদাসের মুখ থমথমে হয়ে গেল। ভাঙা গলায় বললে, নিজের সর্বনাশ নিজেই করে এলুম রে। এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, তা যদি আগে জানতুম। একটু আগেও যদি একবারটি দেখতে পেতুম। শালা সব গ্যাস্ হয়ে গেল মাইরি। উঃ, কি চাইলে ভাই, কি বলব। যেন শীতের দিনে আমার গলায় একখানা নরম কম্ফর্টর জড়িয়ে দিলে।

গৌরদাসের কাণ্ড শুনে অতি দুঃখেও হাসি পেয়ে গেল। আমায় হাসতে দেখে ও খুব চটে গেল। বললে, হাসছিস্। তা তোর আর হাসতে কি? দিন পেয়েছিস্ হেসে নে। আমি মাইরি মরে যাব। বললুম, তুই এত বোদা মেরে গেলি কেন রে?

হাল ছেড়ে দেবার কি আছে ? গৌরদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আর হাল, গোটা নৌকোটাই বানচাল করে দিয়েছি, বুঝলিস্ ? বাঁচব না মাইরি। বললুম এক কাজ কর। দিদির সঙ্গে মিটমাট করে ফ্যাল্। আর দিদিকে সঙ্গে করে ওদের বাড়ীতে একদিন যা। তারপর বুড়োকে জপাতে আর কতক্ষণ। গৌরদাস আলো দেখল, ভোঁটা উৎসাহে লগি মেরে বললে, তাতে কাজ হবে ? ঠিক বলছিস্ তুই ? এখন চলি। তবে মাইরি আবার কাল আসব।

পরদিন গৌরদাস এল না, এল ডলবি। দিন সাতেক আসেনি, দেখি একগাদা ফুল, আর সুন্দর কেক এনেছে পাউণ্ডখানেক। বললে, আম্বালা যাচ্ছি, এয়ারফোর্সে ভর্তি হলুম। এত বড় যুদ্ধটা চোখের সামনে দিয়ে অমনি অমনি বয়ে যাবে ভাই, তা আর সহ্য হল না, এ. আর. পি.তে আর উত্তেজনা নেই, বড্ড ভেজিটেবল্ মেরে গেছে। তাই নাম লিখিয়ে এসেছিলুম। এতদিন তাইতেই ব্যস্ত ছিলুম, আসতে পারিনি। আজ রাতেই ট্রেণ। তোর বাড়ীর ঠিকানা দে। কখনো চিঠি দিই যদি জবাব দিস্। উত্তেজনা-উজ্জ্বল ডলবির চোখ বেদনার ভারে ভারী হয়ে এল। ওর একটা ফটোগ্রাফ বের করে আমায় দিয়ে বললে, মনে রাখবার মতো চিহ্ন কিছু একটা দে। কি দেব ? কোনকালে ছবি তোলাইনি নিজের। মাফলারটা দিয়ে বললুম, যতদিন পারিস্ কাজে লাগাস্ এটা।

ডলবি চলে গেল ভৌমিকও এ. আর. পি. ছাড়ব ছাড়ব করছে। ও প্রায় নিয়মিত আসে। ওর কাছেই শুনলুম ফজলে করিম ওর মামাবাড়ী গেছে, বড় মোতির বিয়ে। ভৌমিক হঠাৎ একদিন এসে বললে, কাল মাইরি কি কাণ্ড। পুলিস এসে আমাদের ডিপো তল্লাশী করে গেছে। ফজলার নামে হুলিয়া হয়েছে। চার্জ সাংঘাতিক। বিয়ের আগের দিন বড় মোতিকে খুন করে সটকান দিয়েছে। কি কাণ্ড বল দিকিনি। বিয়েতে যাবার সময় পঁচিশটে টাকা ধার নিয়েছিল, সে শালা গচ্চাই গেল।

আমার শরীর সেরে উঠেছে। ছাড়ান পাবার দিন ঘনিয়ে এল। পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই হুকুম পেয়ে যাব। দুর্বলতাটুকুই যা আছে, রোগ থেকে রেহাই পেয়েছি। দিন দশেক আর কেউ আসেনি। শুয়ে বসে ক্লান্তি ধরে গেল। বারান্দায় পায়চারি করছিলুম। হঠাৎ দেখি হন্তদন্ত গৌরদাস। জিজ্ঞাসা করলুম, কি ব্যাপার রে? এতদিন বাদে! বলতে কি ওকে দেখে খানিকটা উৎসাহ ফিরে পেলুম। গৌরদাস বললে, উঃ, কি ঝামেলা মাইরি! চ' সবই বলছি। বিছানায় এসে বসতেই গৌরদাস বললে, আর তো সময় নেই, মাত্র ছ' দিন। আজ বেস্পতিবার, আসছে বুধেই বুঝলিস্, সেবেন্ রাউণ্ড, লগ্ন একেবারে সন্ধ্যেয়। যা সময়মত ফন্দী দিয়েছিলি না, মোক্ষম মাইরি। রমু মানে রমলা, কি মিষ্টি নাম বল দিকিনি, যতবার দেখা হয় হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমিও হাসি, এখন আর হাসতে কি? কব্জায় এনে

ফেলেছি। একেই মাইরি ভবিতব্য বলে, নয় আমার বউ হওয়া ওর কপালের লেখা। এ কী আর ফসকায়। সত্যি কি বলবো ভাই, এই তো কদিনের আলাপ কিন্তু টান যা পড়েছে না, যেন জন্মজন্মান্তরের। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে গেছি। মাইরি ধরা পড়ে গেলুম বুড়োর হাতে। তা বুড়োটা লোক খুব ভাল। জিজ্ঞাসা করলে, কি খবর? ভাবছি কি বলব, রমু বেরিয়ে এসে বললে, দিদি খবর পাঠিয়েছে একবার ওখানে যেতে, তুমি যদি বল, ঘুরে আসি। বিয়ের নামে মেয়েদের বুদ্ধির গিঁট পটাপট খুলে যায়, বুঝলিস্। তারপর তুজনে তো বের হলুম। দিদিকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখলুম। ফেরবার পথে দিদি বাসায় চলে গেল, আবার ময়দানে একটু ঘুরেটুরে বাপের জিম্মা করে দিয়ে এলুম ওকে। আজও তো ওখান থেকেই আসছি। এই ছ' দিন আর যাব না বলে এসেছি। শুনে ইস্তক ওর মুখখানা কালো কালো হয়ে গেল। বললে, এ ক'দিন কি করে থাকব? শোন কথা! এত বচ্ছর কাটাতে কোন কষ্ট হল না, আর এই কটা দিন, হুঃ! আবার আসবার সময় হুঁশিয়ার করে দিলে, সাবধানে রাস্তাঘাটে চল। বল দিকিনি, কি বলতে ইচ্ছা করে। কচি খোকা পেয়েছে নাকি? বলতে ভরসা পেলুম না, সত্যি করেই কচি খোকা বনে গেছিস্ গৌরদাস। উচ্ছ্বাস কিছু কমে এলে গৌরদাস বললে, তুই কিন্তু থাকবি আমার বিয়েতে। বললুম, পাগল। এখান থেকে ছুটিই

পাব না। তার উপর শরীর তো ভাল নয়। ও বললে, সে খবর না নিয়েই কি নিশ্চিন্ত আছি ভেবেছিস্। তুই খালাস পাবি মঙ্গলবারে। এখান থেকে সটান আমার বাড়ী চলে যাবি। এই নে ঠিকানা রাখ। তোকে কুস্তি তো আর করতে হচ্ছে না, এই শরীরেই বেশ চলবে। যাস্ ভাই, আমার তো আর ভাই বেরাদার কেউ নেই। আর পিঠ চুলকানোর মতো বিয়েটাও একা একা জমে না মাইরি। গৌরদাসের পীড়াপীড়িতে রাজী হলুম। বললুম, যদি এরা ছাড়ে তবে নিশ্চয়ই যাব। খুশীতে গৌরদাস নতুন টাকার মতো চকচকে হয়ে বেরিয়ে গেল।

মঙ্গলবার বিকালে হাসপাতাল থেকে সত্যিই আমাকে বিদায় দিলে। বেরিয়ে সোজা গৌরদাসের দেওয়া ঠিকানায় চললুম। এর মধ্যে ও আর আসেনি। নিশ্চয়ই বিয়ের ব্যাপারে খুব ব্যস্ত রয়েছে। গৌরদাসের মুখে যতটুকু শুনেছি তাই দিয়ে মনে মনে কেন যেন মেয়েটির একটি চেহারা তৈরি করতে লেগে গেলুম। বেশ ভালই লাগছিল। বাসের ঝাঁকুনি আর লোকজনের ভিড়ে চেহারাটা মধ্যে মধ্যে পালটে যাচ্ছিল। তবু মোটামুটি সুশ্রী একটা মেয়ের খসড়া তৈরি করলুম। রংটা শ্যামবর্ণ, গড়াপেটা বাঁধুনি, টিকোলো নাক, ঠোঁটের নীচে একটা তিল। পরিহাসপ্রিয় সপ্রতিভ একটি মেয়ে। জানিনে আসল মেয়েটির সঙ্গে এর মিল আছে কোথায়? বিয়ে হবার সম্ভাবনায় গৌরদাসের স্পষ্ট এক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অবসাদক্লিষ্ট

আমার মনে গৌরদাসের তাজ. ঢেউ-এর ছোঁয়াচ লাগল নাকি ? মেয়েটিকে নিয়ে গৌরদাস এরই মধ্যে ভবিষ্যতের একটা ছবিও এঁকে ফেলেছে। সেদিন প্রথম যখন গৌরদাস এল, কেমন মুষড়ে পড়েছিল আশঙ্কায়। আর তার ক'দিনের মধ্যেই কী পরিবর্তন! আমার হাসি পেল গৌরদাসের কথা মনে হতেই।

ভাবতে ভাবতে ওর বাসার দরজায় এসে হাজির হলুম। ভেতরে গানবাজনার আওয়াজ। খুব জমিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। বাসাটা তিনতলা। ঢুকেই একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম। বলতে পারলে না। গানবাজনাটা তা হলে অন্য লোকের ঘরে। সিঁড়ির মুখে আরেকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। জিজ্ঞাসা করতে বললে, গৌরদাস ? ইলেক্‌ট্রিক মিস্তিরি। তেতলায় এই বাঁ দিকের কোণের ঘর।

উঠে দেখি ওদের ঘরের দরজা বন্ধ! ধাক্কা দিলুম। এক বিধবা দরজা খুলে দিলেন। বললুম, আপনি তো গৌরদাসের দিদি ? মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই প্রণাম করতে গেলুম। বাধা দিয়ে বললেন, গৌর বলেছে তুমি আসবে। এসো। ঢুকেই দেখি ঘরে আরো দুজন লোক। পাশের ঘর থেকে এক ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। বললেন, এক্ষুণি একবার জ্ঞান হবে। তবে কোনো আশা নেই। কি ব্যাপার ? ডাক্তার কার জন্যে ? গৌরদাস কোথায় ? দিদি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল কেন ? আমার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

দুর্বল শরীরে এতখানি তেতলার সিঁড়ি বেয়েছি। পরিশ্রম বড্ড বেশী হয়েছে। ডাক্তারবাবুকে একটা ইনজেকশন তৈরী করে পাশের ঘরে ঢুকতে দেখলুম। লোক দুটিও গেল। দিদিকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে? গৌরদাস কোথায়? দিদি ডুকরে কেঁদে উঠতেই পাশের ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে বললে, আসুন, জ্ঞান ফিরেছে। সবাই চলে গেল। একটু পরেই দিদির কান্না শুনতে পেলুম। লোকটি আবার বেরিয়ে এল। বললে, এস, তোমাকেই খুঁজছে। চমকে উঠলুম, আমাকে কে খুঁজছে? গৌরদাস না তো? থর থর করে কেঁপে উঠলুম। আশঙ্কার গলাটা টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, কে খুঁজছে? লোকটি আমার হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা মারলে, গৌরদাস।

আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে। আর চলতে পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছে পড়ে যাব। গৌরদাসের খাট ধরে দাঁড়ালুম। ওর আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জিজ্ঞাসা করলে, কে? ডাকলুম, গৌরদাস। চিনলে। গলা পরিষ্কার করে বললে, এসেছিস্? শুধু শুধু হয়রাণ করালুম মাইরি। ফসকেই গেল। সর্বশরীর বেগুন পোড়া হয়ে গেছে। এ চেহারা নিয়ে ছাঁদনাতলায় দাঁড়ানো যায়, তুই বল? আর বলতে পারল না, নেতিয়ে পড়ল।

বিকেল নাগাদ সব শেষ হয়ে গেল। শুনলুম, কাল দুপুরে আগুন লেগেছিল ওদের পাড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই মজা

দেখছে। হঠাৎ গৌরদাস দেখতে পায় একটা বাচ্চা ছেলে আটকা পড়েছে ঘরের মধ্যে। কারোর নিষেধ না মেনেই ও দৌড়ে ভেতরে ঢোকে, কিন্তু বেরিয়ে আসতে আর পারেনি। ছেলে সমেত চাল চাপা পড়ল। ছেলেটা মারা গেছে। দমকলের লোকেরা ওর ঝলসানো দেহটা টেনে বের করে আনে। তিনবার ওর জ্ঞান হয়েছিল। তার মধ্যে আমাকে খুঁজেছে আর বিয়ের কথাই শুধু বলেছে।

ভাঙা একটা টিনের স্যুটকেস সম্বল করে একদিন কলকাতায় এসেছিলুম। আর এই কলকাতা ছাড়লুম এক ভাঙা মনের তোরঙ্গ ঘাড়ে করে। হাওড়ার নতুন পুলের আদ্ধেকটা তখন তৈরী হয়েছে। পুরোনো পুলটার ওপর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। নতুন পুলের অর্ধসমাপ্ত গার্টারগুলো গঙ্গার উপর ঝুলে রয়েছে। আমার মনে হল ওগুলো অভ্যর্থনা-আকুল কলকাতার প্রসারিত দুটি বাহু! সস্নেহ দুটি বিশাল বাহু বাড়িয়ে স্মিত হেসে কলকাতা যেন বলছে, আগচ্ছ, ইহ আগচ্ছ। এসো, ফিরে এসো। এসেছি, বার বার এসেছি এই কলকাতায়। আনন্দ পেয়েছি, আঘাত খেয়েছি। বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে ফিরে গেছি। তবু কলকাতার ডাক এড়াতে পারিনি। কিন্তু থাক সে তো নতুন কেচ্ছা।

কথা আর বাড়াব না। কথারা যেন ঘামাচি। সুখের জন্য যতই মারি, এর আর শেষ নেই।